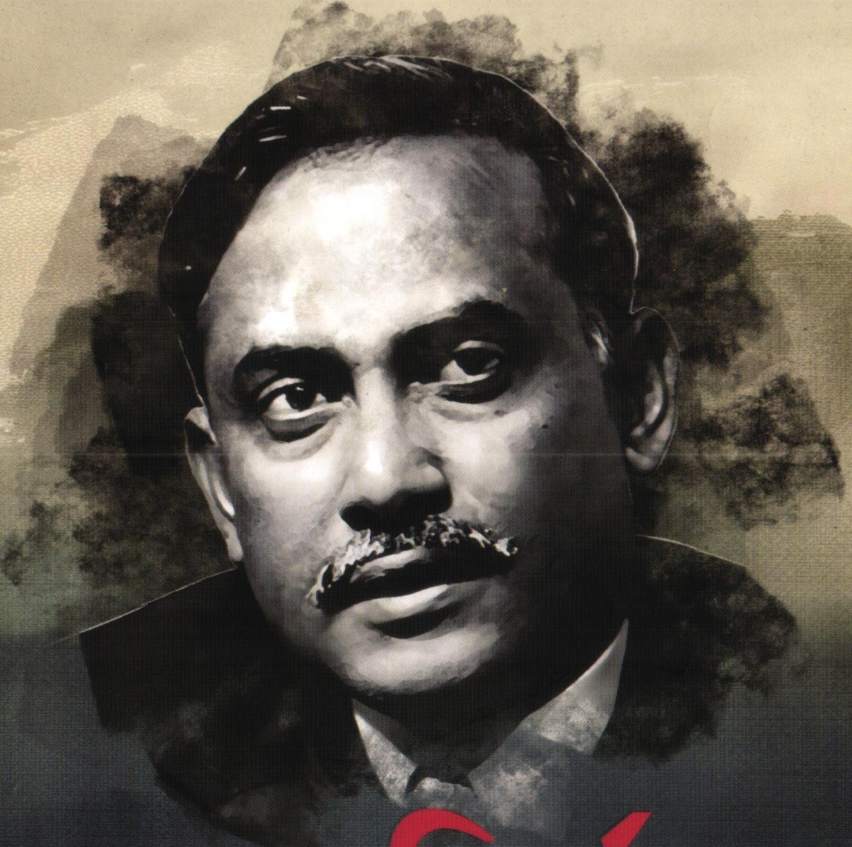

জ্যোতির্ময় জিয়া

এবং

কালো মেঘের দল

আবদুল হাই শিকদার

জ্যোতির্ময় জিয়া

এবং

কালো মেঘের দল

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

জ্যোতির্ময় জিয়া

এবং

কালো মেঘের দল

আবদুল হাই শিকদার

শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকাল
প্রথম শোভা প্রকাশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫
চতুর্থ সংস্করণ : ১৪ জানুয়ারি ২০১৭
তৃতীয় সংস্করণ : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১
প্রথম সংস্করণ : ১৫ জুন ২০১১

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
শোভা প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট
তৃতীয় তলা ঢাকা-১১০০

স্বত্ব
আবিদা শিকদার

বর্ণবিন্যাস
এ্যাপেলটক কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
আদনান রিজন

মুদ্রণ
একাত্তর প্রিন্টার্স

মূল্য
৩৭৫ টাকা

ISBN : 978 984 94766 8 9

JOTIRMOY ZIA ABONG KALO MEGHER DALL by Abdul Hye Sikder; Published by Mohammad Mizanur Rahman, Shova Prokash, 38/4 Banglabazar, Mannan Market, Dhaka-1100, Price : 375.00 Taka Only.

ঘরে বসে শোভা প্রকাশ এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http:// rokomari.com/shovaprokash
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭।

www.nagorikpathagar.org

উ ৎ স র্গ

ড. মামুন রহমান এফসিএ-কে
বাংলাদেশের আনন্দ ও বেদনার সাথে
সর্বাবস্থায় মিশে থাকে যাঁর হৃদয়

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম সংস্করণ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের ঘৃণ্যতম স্বৈরশাসক, রক্তপিপাসু ফ্যাসিস্ট, গণহত্যাকারী, আধিপত্যবাদের তাঁবেদার শেখ হাসিনা ও তার অবৈধ সরকারকে উৎখাত করে, আমাদের সন্তানরা উদ্ধার করেছে হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা। মুক্তির আনন্দে উদ্বেল আজ সারাদেশ। এই স্বাধীনতা ও আনন্দকে ফিরিয়ে আনতে আমাদের সন্তানরা যে অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা, জুলুম, নির্যাতন সয়েছে, অকাতরে ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত, সমকালীন ইতিহাসে তার কোনো দ্বিতীয় নজির নাই। ৫ আগস্ট তাই সাধারণ কোনোদিন নয়, আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস।

এমন মহিমান্বিত ক্ষণে যার নাম উচ্চারণ করা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, সঙ্গত, যৌক্তিক ও অপরিহার্য, তিনিই তো শহীদ জিয়াউর রহমান। কাপুরুষ আওয়ামী নেতৃত্বের পলায়নপরতা দেখে সারাদেশের মানুষ যখন স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়; সেই সময় আশাহীন ভাষাহীন দিশাহীন জাতির সামনে ধ্রুব তারকার মতো উদিত হন জিয়াউর রহমান। ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে তিনি প্রথম বাঙালি যিনি ঘোষণা করলেন 'উই রিভোল্ট'। ২৬শে মার্চ ২৭ মার্চ ঘোষণা করলেন বহু সাধ ও স্বপ্নের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। কালুরঘাট থেকে সে ঘোষণা স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়লো সারাদেশে। জাতি পেয়ে গেল আকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব। এখানেই শেষ নয়, তার নেতৃত্বে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষে কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে ফিরে গেলেন নিজ পেশায়। আবার ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ এ সংঘটিত ঐতিহাসিক সিপাহী জনতা বিপ্লব তার মাথায় পরিয়ে দিলো নায়কের মুকুট। তার পরের ইতিহাস দেশ গড়ার ইতিহাস। গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও উন্নয়নকে প্রতিষ্ঠিত করার ইতিহাস। এই ভূখণ্ডের তিনিই একমাত্র শাসক যিনি জাতির আত্মপরিচয়ের সংকটকে চিরকালের মতো মুছিয়ে দিয়ে প্রবর্তন করলেন রাষ্ট্রদর্শন 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'।

www.nagorikpathagar.org

মহামানব শহীদ জিয়াকে নিয়ে বিরচিত 'জ্যোতির্ময় জিয়া ও কালো মেঘের দল' বইটি বহুদিন থেকে বই বাজারে নেই। শেষ হয়ে গেছে চতুর্থ সংস্করণও। এই রকম অবস্থায় পঞ্চম সংস্করণ বেরুচ্ছে। একজন লেখক হিসাবে এটা আমার জন্য এক মহার্ঘ প্রাপ্তি। বর্তমান সংস্করণের প্রকাশক আমার সুহৃদ, সাথী মিজানুর রহমান। তাকে শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে দায় সারতে চাই না।

প্রিয় পাঠক আগের সংস্করণগুলোর মতো বর্তমান সংস্করণটিও যদি আপনাদের মনোযোগ পায়, তাতেই আমি ধন্য।

আবদুল হাই শিকদার

জাতীয় প্রেসক্লাব
২৬ আগস্ট ২০২৪

www.nagorikpathagar.org

ভূ মি কা

এ কথা আজ দিবালোকের মতো সত্য, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর করে এর মানচিত্র পাল্টে ফেলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ। এ কর্মে বাইরে এবং ভিতরে দুই ক্ষেত্রেই সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নামিয়েছে তাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক তাবেদার ও অনুগ্রহভাজন গণমাধ্যমকে।

এ সম্মিলিত শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হিসেবে চিহ্নিত করেছে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'কে। জিয়ার অসাধারণ জনপ্রিয় ইমেজ, জাতীয়তাবাদী শক্তি ও তাঁর পরিবারকে সর্বসমক্ষে হেয় করার এহেন কোনো চক্রান্ত নেই যা এরা করেনি। এরা অনুধাবন করেছে, জিয়ার রাজনৈতিক দর্শনকে পরাজিত করা না গেলে বাংলাদেশকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। সেজন্যই কখনো সংসদ, কখনো বিচারালয়কে ব্যবহার করে তাঁর ওপর চালিয়েছে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারবর্জিত জিঘাংসায় উন্মত্ত হিংস্র আক্রমণ।

শিক্ষিত, রুচিশীল, দেশপ্রেমিক সচেতন মানুষ এতে আহত হয়েছেন। শিকার হয়েছেন অন্তর্গত রক্তক্ষরণের। ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ কেউ কেউ এসব রাষ্ট্রঘাতী চক্রের বিরুদ্ধে কল্যাণ ও মঙ্গলের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তারা চেয়েছেন এই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচনের। তাদেরই একজন যুক্তরাজ্য প্রবাসী আমার পরম সুহৃদ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট ড. মামুন রহমান এফসিএ। আমার দেশ খুলনার ব্যুরো প্রধান অনুজতুল্য এহতেশামুল হক শাওন ছিলেন মধ্যস্থতাকারী। তার বিরতিহীন তাগাদা এবং সামগ্রিক সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত পাঠকের টেবিলে নিয়ে এলো 'জ্যোতির্ময় জিয়া এবং কালো মেঘের দল'কে।

শহিদ জিয়ার ওপর অনেক গ্রন্থ বেরিয়েছে। যার বেশিরভাগই আসলে বিভিন্নজনের লেখার সংকলন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একই রচনা বিভিন্ন শিরোনামে গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়েছে মাত্র। জিয়ার জীবন ও অবদানের ওপর আজও আমরা পাইনি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ। যেমন নির্মিত হয়নি সত্যজিৎ রায়ের মতো নান্দনিকতা নিয়ে দায়িত্বশীল কোনো প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। আমার গ্রন্থও হয়তো এই সাধারণ মিছিলের যাত্রী। তারপরও এ

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থ পাঠের অনুরোধ থাকবে সকলের কাছে। আমি একদিকে যেমন চেষ্টা করেছি জিয়া-বিদ্বেষের কারণ উদ্‌ঘাটনের, তেমনি অন্যদিকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একমাত্র সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনদাতার স্থান নির্ণয়ের।

পরিশিষ্টে যুক্ত করেছি ইচ্ছে করে, শহিদ জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা, ৭ নভেম্বরকেন্দ্রিক বক্তব্য। একই সঙ্গে চেয়েছি, যে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের অভাবে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলটির নেতা-কর্মীরা প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে বারবার অসহায় হয়ে পড়ে, সেই অভাব মোচনের। কারণ, আমাদের ইতিহাসে জিয়াই একমাত্র রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক যিনি নেতা ও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি নিজে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশ নিতেন। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে দেওয়া তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না করে পারলাম না।

১৯৮১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট জিয়ার অনুমোদন নিয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য বিএনপি প্রকাশ করেছিল 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল : ক্যাডার প্রসঙ্গ' শীর্ষক পুস্তিকাটি। অর্থবিত্ত ও নাম কামানোর জন্য যেসব বেহুঁশ নাফরমান আজ জাতীয়তাবাদী সেজে ঘুরঘুর করে, তাদের প্রতিরোধে সত্যিকারের ত্যাগী দেশপ্রেমিক জিয়ার-সৈনিকদের নিজেদেরকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ পুস্তিকাটিও হতে পারে এক বড় অস্ত্র।

মুক্তিযোদ্ধা শমসের মবিন চৌধুরীর স্মৃতিচারণ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) খালেকুজ্জামান-এর উপস্থিতি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার তাৎপর্যপূর্ণ শব্দপঞ্জি বটে। ৭ নভেম্বরকেন্দ্রিক রচনা ও কবিতাগুলো প্রাসঙ্গিক কারণেই জায়গা করে নিল এই বইয়ে।

মোশাররফ আহমেদ ঠাকুরকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। তার মাধ্যমেই আমি সংগ্রহ করি 'ক্যাডার প্রসঙ্গ' পুস্তিকা ও শহিদ জিয়ার প্রশিক্ষণ ক্লাসের ভাষণ দুটি। অনুজ প্রতিম বিপাশ আনোয়ারের কাছ থেকে নিয়েছি স্বাধীনতা ঘোষণা ও ৭ নভেম্বরের ভাষণগুলো। বইটির নামের ব্যাপারে সুজিত কুমার সেনগুপ্তের কাছে আমার ঋণ আছে।

প্রকাশক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সবসময়ই মমতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার দিকে। এবারও তার ব্যত্যয় হয়নি।

১৯ জুন ২০১১ আবদুল হাই শিকদার

www.nagorikpathagar.org

সূ চি প ত্র

যুগনায়ক জিয়া : শ্রেষ্ঠত্বের মানচিত্র ॥ ১৩
জ্যোতির্ময় জিয়া এবং কালো মেঘের দল ॥ ২০
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাদান অভিলাষ : জিয়া উচ্ছেদ প্রকল্প ॥ ২৯
একজন হাবিলদার অন্যজন মেজর ॥ ৪৪
সচিত্র স্বদেশের শহীদ জিয়া : প্রথম অ্যালবাম ॥ ৪৯
এনসিটিবির ঘাড়ে স্যাবোটাজের ভ্যাম্পায়ার :
পাষণ্ড পীড়নে পথ্য প্রদান ফরমুলা ॥ ৬১
অবিস্মরণীয় ৭ নভেম্বর : 'আবার তোরা মানুষ হ' ॥ ৬৯
স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ ॥ ৭৬
জিয়া শহীদ জিয়া ॥ ৮০
জিয়া সঙ্গীত ॥ ৮৪
সাত নভেম্বর ॥ ৮৬
জিয়া বাংলাদেশ ॥ ৮৮

প রি শি ষ্ট

বাংলাদেশের প্রভিশন্যাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে
জিয়াউর রহমানের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা ॥ ৯১
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা ॥ ৯২
জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা (ইংরেজি ভার্সন) ॥ ৯৩
৭ নভেম্বর ১৯৭৫ প্রত্যুষ : দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জিয়ার প্রথম ভাষণ ॥ ৯৪
৭ নভেম্বর ১৯৭৫ অপরাহ্ন : দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জিয়ার দ্বিতীয় ভাষণ ॥ ৯৫
ষড়যন্ত্রকারীদের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখুন ॥ ৯৬
জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত
দেশী-বিদেশী চক্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন ॥ ৯৮
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল : ক্যাডার প্রসঙ্গে ॥ ১০২
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের
ক্যাডার প্রশিক্ষণ ক্লাসে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভাষণ ॥ ১২৪
স্বাধীন জাতির স্বাধীন উপলব্ধি : প্রশিক্ষণ ক্লাসে জিয়ার আরেকটি ভাষণ ॥ ১৪৩
জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা নিজ কানে শুনেছেন শেখ হাসিনা ॥ ১৫৮
একাত্তরের রণাঙ্গনে জিয়ার বীরত্বগাথা : শমসের মবিন চৌধুরীর স্মৃতিচারণ ॥ ১৬৪
জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ও কালুরঘাট যুদ্ধ :
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) খালেকুজ্জামানের বর্ণনা ॥ ১৭০

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

যুগনায়ক জিয়া : শ্রেষ্ঠত্বের মানচিত্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধজুড়ে স্বধর্ম ও স্বসমাজকে রক্ষা করার জন্যে চারণের মতো দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। তার প্রাতঃস্মরণীয় উক্তি ছিল– "ভাবে মন দমে দম, রাহা দূর বেলা কম।" এই কথা ক'টি যশোরের ছাতিয়ানতলায় তার কবরের গায়েও খোদিত আছে।

আমাদের রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই উক্তির নির্গলিতার্থ জানেন না, তা নয়। জানেন, কিন্তু মনে থাকে না। মনে রাখেন না। রাখেন না বলে যাচ্ছেতাই করে বেড়িয়ে প্রয়োজনীয় সময়গুলো নষ্ট করে– নিজেদেরও পরিণত করেন ভাগাড়ের বাসিন্দায়। আর সমাজকে করেন দূষিত। এই দূষণ এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চাইতে অনেক বেশি।

এতটাই বেশি যে, সহ্যসীমার শেষ বিন্দু পার হয়ে গেছে। ফলে রাজনীতি থেকে উধাও হয়ে গেছে 'নীতি'। নীতির জায়গা দখল করেছে শিষ্টাচারবর্জিত, অসভ্য, অশ্রাব্য গালাগালি। আর এখন যে মানুষটির ওপর কোমর বেঁধে এই কুৎসিত কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ গালাগালের বল্লম অবিরাম গতিতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, তিনি জিয়াউর রহমান। আমাদের এই মহান জাতির এক দুঃসময়ের কান্ডারি, জাতীয় নেতা। কেন এবং কী কারণে এসব 'জংলি' আচরণ, তার স্বরূপ উন্মোচন অন্যত্র করেছি। এখানে একটু ভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই।

আমাদের অপসংস্কৃতি রাজনীতির আরেক বড় ব্যামো হলো একজনের ব্যাপারে কথা বললেই অন্যজনের নাম সামনে নিয়ে আসা। তারপর দু'পক্ষ বসে উল্লিখিত দুটি নামের হাজার হাজার ছিদ্র বের করে, সত্য-মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করে। আবার নাম দুটি যদি হয় কোনো জাতীয় নেতার, তাহলে তো কথাই নেই।

চৌদ্দগুষ্টি তুলে, শাপ-শাপান্ত করে তার সব অবদান, অর্জন ও ত্যাগকে ধুলায় মিশিয়ে তারপর বুড়িগঙ্গার নোংরা পানিতে আরও খানিকটা নোংরা বর্জ্য ত্যাগ করে তবেই ফিরে যায়।

www.nagorikpathagar.org

তুলনামূলক আলোচনার দরকার নেই, তা নয়। তা থেকে ভালো কিছু পাওয়াও যেতে পারে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে চিলের মতো নিচের দিকে। ফলে জাতির 'চাতক হৃদয়' হয় ব্যথিত, ক্ষুব্ধ। তারা তাদের সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের জিঘাংসা-উন্মত্ত কাণ্ডকারখানা দেখে হয় স্তম্ভিত।

আমাদের এসব দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের সামনে কোরআন-বেদ-বাইবেল-ত্রিপিটকের বাণী আওড়ে গেলে তারা খুব মন দিয়ে শোনে। কিন্তু কাজের বেলায় যথা পূর্বং তথা পরং। অনেকটা কুকুরের লেজের মতো। যতই চেষ্টা করুন, যতই তেল-তোয়াজ করুন– ওটি সোজা হওয়ার নয়। যেই ছেড়ে দিলেন, অমনি তা আবার বাঁকা হয়ে গেল। আমাদের জাতীয় নেতাদেরও এদের হাতে পড়ে সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাঁদরের গলায় যেমন মুক্তাহার মানায় না, তেমনই আমাদের বর্তমানের একশ্রেণির রাজনীতিবিদের গলায় এসব জাতীয় নেতার নাম নেওয়া মানায় না। আবার নিলেই চলে আসে তুলনা করার প্রসঙ্গ, যা অনভিপ্রেত নয়।

আমরা ভুলে যাই, খাজা সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব, ওসমানী কিংবা জিয়াউর রহমান– তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জাতির জন্য সেরাটাই উজাড় করে দিয়ে গেছেন।

তাদের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু সেই সীমার পীড়নকে ধারণ করেও তো তাঁরা হয়ে উঠেছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস তাঁদের সবার জন্য আলাদা আলাদা জায়গা করে দিয়েছে। আমাদের কাজ হবে এই ইতিহাসকে জীবনের অবলম্বন করা। চোখের সামনে, জীবনের সর্বত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে রাখা। যার ফলে সমৃদ্ধ হবে বর্তমান। নিশ্চিত হবে ভবিষ্যৎ যাত্রা। এ অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি নয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আলো গ্রহণ করা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের একশ্রেণির অঙ্গীকারহীন, আদর্শহীন, মূর্খ রাজনীতিবিদ ও একশ্রেণির বাচাল বুদ্ধিজীবীর কারণে সেই কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে যাওয়ার জো নেই। জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বৃদ্ধি করার জো নেই। তারা সর্বতোভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছে জাতির মধ্যে অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, বিভেদ ও হানাহানি সৃষ্টির কাজে। ফলে তাদের সৃষ্টি আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে পরিষ্কার চোখ দিয়ে আকাশ দেখার উপায় নেই। শহিদ জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কথা বলার আগে এই দিকটির কথা মনে রাখতে হবে। কারণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে রাজপথে কিংবা সংসদে বিবেকবর্জিত,

www.nagorikpathagar.org

ঘৃণ্য, নৃশংস, হিংস্র আক্রমণের যে তাণ্ডব এখন দেশে শাসককুল ও তাদের চেলাচামুণ্ডারা চালাচ্ছে– এমনটি আর কোনোদিন কখনও আমরা দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পেঁচা রাষ্ট্র করে বেড়ায় পেলে কোন ছুতা, জান না সূর্যের সাথে আমার শত্রুতা।' পেঁচা হলো অন্ধকারের প্রাণী। অন্ধকারেই তার আহার ও বিহার। সকালে সূর্য ওঠে বলে তার কাজ বিঘ্নিত হয়। জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে আশ্রয় নিতে হয় গোপন কোঠরে। জিয়াউর রহমানের শত্রুরা অনেকটা সেই রকমই। আবার মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের মতো করে বলা যায়, 'যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাসী/সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।'

দেশের স্বাধীনতার জন্য, প্রথম বাঙালি প্রথম সৈনিক যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে ঘোষণা করলেন, 'উই রিভোল্ট', যিনি দেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, নভেম্বর বিপ্লবের নায়ক, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দর্শনের মাধ্যমে দেশটিকে আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উদ্ধার করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করে দিয়ে গেছেন, যিনি বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ থেকে উদ্ধার করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলেন।

যিনি আওয়ামী লীগের দ্বারা কবরস্থ গণতন্ত্রকে মাটি খুঁড়ে বের করে এনে তাকে নতুন করে বাঁচতে শেখালেন, সেই মানুষটিকে যারা স্রেফ দলবাজির কারণে, ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার ইতর মানসিকতার কারণে, বিশেষ কোনো দেশের ইঙ্গিতে বা আদেশে, তাঁর ভাবমূর্তি ধ্বংসের কাজে বেহুঁশের মতো মাঠে নেমেছে– তাদের মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। অন্যের প্ররোচনায় যারা নিজের আত্মার আত্মীয়কে হত্যা করতে পারে, তারা কি মানুষ? আর মানুষ হলেও তাদের জন্ম-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

দেশের যা সম্পদ, যা কিছু গৌরবের, তার বিরুদ্ধে শুধু তারাই কথা বলতে পারে– যারা কোনো না কোনোভাবে আধিপত্যবাদের কাছে বন্ধক দিয়ে এসেছে বিবেক। নইলে কোনো দেশপ্রেমিকের পক্ষে জিয়ার বিরুদ্ধে এ ধরনের সিন্ডিকেটেড অসভ্য ক্যাম্পেইন চালানো সম্ভব ছিল না।

তবে মনে রাখতে হবে, বিতর্ক হয় সেখানে মহত্ত্ব থাকে যেখানে। মৌচাকেই মৌলোভীরা ঢিল ছোড়ে। চোর বা ডাকাতরা নিজেদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় যে বাধা, সবসময় সেটাই তো সরাতে চাইবে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের ইতিহাসের দু-একটি পাতা যাদের পড়া আছে, কিংবা বিশ্ব ইতিহাসের অলিগলির কিঞ্চিৎ খোঁজখবরও যারা রাখেন, তারা জানেন, জিয়া সত্যিকার অর্থেই এক যুগনায়ক–ইতিহাসের নায়ক। সময়ের শ্রেষ্ঠ উপহার। প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনে নিজের গরজেই তাঁকে গড়ে তুলেছিল। নইলে সেই ঘোর দুর্দিনে, অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টিবিঘ্নিত রাতে জাতিকে আলোর দিশা দেখাত কে? এই নিরিখটা মনে রেখেই কোনো বিশেষ আবেগ কিংবা বিদ্বেষের বশবর্তী না হয়ে নির্মোহ চোখে খুলে বসতে হবে বিশ্লেষণের খাতা।

রোগজর্জর 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' তুরস্ককে বাঁচানোর জন্য সেদিন যেমন দরকার হয়ে পড়েছিল একজন কামাল আতাতুর্কের, তেমনি (১০ লাখ মানুষ যে দেশে না খেয়ে মরেছিল, আর আওয়ামী লীগের লোকজন হয়ে উঠেছিল আঙুল ফুলে কলাগাছ) বাক্ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাশূন্য মুমূর্ষু 'তলাবিহীন ঝুড়ি'কে বাঁচানোর জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল একজন জিয়াউর রহমানের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ফ্রান্সকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য, তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য সেদিন যেমন দ্য গল ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না, বাংলাদেশের জন্য তেমনই জিয়া।

আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা নাসের যেমন ইতিহাসের এক মহাসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আরব জাতিকে দিয়েছিলেন বেঁচে থাকার প্রেরণা, জুগিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস ও শক্তি, ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন আত্মপরিচয়ের সংকট, নির্মাণ করেছিলেন এক ইস্পাতঢালা সংহতি ও ঐক্য–বাংলাদেশের বেলায় একই কাজ করেছিলেন জিয়া।

ঘানার যেমন নক্রুমা, কিউবার যেমন ফিদেল ক্যাস্ট্রো, ভারতের যেমন নেহরু, মালয়েশিয়ার যেমন মাহথির মোহাম্মদ, বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান ঠিক তা-ই।

আমাদের তার্কিক বন্ধুরা হয়তো একে বাঁকা চোখে দেখবেন। তারা দেখতেই পারেন। সে অধিকার তাদের আছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা থাকবে– দয়া করে সবদিক খতিয়ে দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। তাহলে আর একে অতিশয়োক্তি মনে হবে না।

বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের পাতাগুলোর দিকে একবার পেছন ফিরে তাকানোর অনুরোধ করব। 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীড়ে' সঞ্জীবিত যে বাংলাদেশ–সেই বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি বাঁকের নায়কদের প্রতি অঢেল শ্রদ্ধা রেখেও বলব–

www.nagorikpathagar.org

তাদের সবার মধ্যে জিয়াউর রহমানের আসনটি আলাদা এবং উজ্জ্বল। একটু ব্যতিক্রম। কারণ তাঁরা সবাই দেশ ও জাতির প্রয়োজনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আজ অবিনশ্বর মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

তাঁদের কারোরই অবদান ছোট নয়, অমর্যাদার নয়। তাঁরা সবাই কম-বেশি করে আমাদের মাঝে বিরাজ করেন। তাঁদের আত্মত্যাগের রক্তাক্ত পথেই তো আমরা মানুষ হয়েছি। পেয়েছি স্বাধীন দেশ। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান একটি করে। শশাঙ্ক, গোপাল নৈরাজ্যের অবসান করে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করেছিলেন দেশ। বখতিয়ার খিলজি বঙ্গ বিজয় করে নতুন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ দিল্লির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন টাকশাল। সোনারগাঁয়ের পতন তাঁর হাত দিয়ে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ 'বাংলা' নামের দেশের জনক।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ 'বাংলা'কে প্রথম রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিয়েছিলেন। আলাউদ্দিন হোসনে শাহ সাহিত্যে ও সম্পদে স্বর্ণযুগ এনেছিলেন। ঈশা খাঁ দিল্লির সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে শিখিয়ে গেছেন। সিরাজউদ্দৌলা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অকাতরে ঢেলে দিয়ে গেছেন নিজের জীবন। মজনু শাহ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ কিংবা সূর্যসেন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বোঝাতে পেরেছিলেন বঙ্গভঙ্গের পথই স্বাধীন বাংলাদেশের পথ।

শেরে বাংলা বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্থপতি–এই মধ্যবিত্তরাই পরে পাকিস্তান আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ অর্জন করে। সোহওয়ার্দীকে বলা হয় গণতন্ত্রের মানসপুত্র। মওলানা ভাসানী রাজনীতিকে প্রাসাদ থেকে পৌঁছে দেন সাধারণ মানুষের ঘরে। শেখ মুজিব জাতিকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে অর্জন করে অনন্যসাধারণ মহিমা।

ব্যাখ্যা ছাড়া দ্রুতরেখ অর্থাৎ সারকথা এগুলোই। আবারও বলি, তাদের প্রত্যেকের অবদান জনগণের হৃদয়ের সর্বোচ্চ ভালোবাসায় অভিসিক্ত। তাঁদের ছোট করে দেখবে কোন গাধা? ছোট করার প্রশ্নই আসে না। বরং তাঁদের ত্যাগ ও অবদান থেকে প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণটাই হবে আমাদের 'ফরজ'।

আগে যে কথা বলেছি, জাতীয় ইতিহাসের এই তারকাখচিত বিশাল আকাশ–আমাদের জাতীয় বীর এবং নায়কদের পৃথিবী–তার মধ্যে জিয়ার

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা ও অবদান খানিক অন্যরকম। কারণগুলো বিস্তারিত করে খতিয়ে দেখা সময়সাপেক্ষ। সামান্য আলোকপাত করছি।

জিয়ার একক অবদান যেগুলো আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সেগুলোর উল্লেখ শুরু করব। প্রথম কথা, জিয়া প্রথম বাঙালি এবং এবং প্রথম সৈনিক যিনি 'উই রিভোল্ট' বলে পাকবাহিনী ত্যাগ করেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক। বিচারপতি খায়রুল হক যত আইনই জারি করুন, কিংবা যত গোস্‌সাই করুন, তাতে দেশপ্রেমিক জাতির খুব একটা যায় আসে না। কারণ তারা সবাই জানেন কে এই অসাধারণ কাজটি করেছিলেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক। তিনি সেক্টর কমান্ডার। তিনি 'জেড ফোর্স-এর নির্মাতা। তিনি ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতা বিপ্লবের মাধ্যমে জাতিকে দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তিনি গণতন্ত্রকে পুনর্জীবন দান করে প্রবর্তন করেন বহুদলীয় গণতন্ত্র।

তিনি তলাবিহীন ঝুড়িকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলেন। ভিক্ষুকের হাতকে পরিণত করেছিলেন কর্মীর হাতে। জনশক্তি রফতানি এবং গার্মেন্ট শিল্পের তিনি সূচনাকারী। তিনি সত্যিকার অর্থেই আধুনিক বাংলাদেশের পথিকৃৎ।

আমার কাছে এ সবকিছুর চাইতেও যে অবদানকে আরও বেশি ব্যঞ্জনাময় বলে মনে হয়, তা হলো তাঁর 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'।

আমাদের জাতীয় জীবনে যে আত্মপরিচয়ের সংকট কৃত্রিম ও অকৃত্রিম দু'ভাবেই ছিল, দেশটা কেন, কাদের জন্য, এই দেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, গন্তব্য কী, স্বপ্ন কী-এর সবকিছুর সমাধান তিনি তাঁর এই রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে সংস্থাপন করেন। ফলে বাংলাদেশ বিভেদ ও হানাহানির বাইরে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি তৈরির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পাটাতন লাভ করে।

আমাদের জাতীয় নেতাদের কারও অবদানকে সামান্য পরিমাণ খাটো না করেও বলা যায়, বাংলাদেশি জাতির জন্য এই প্রথমবার জিয়ার মাধ্যমে আমরা পেলাম একটা রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন। যে দর্শনের অনিবার্যতা কিংবা অপরিহার্যতা বিচারপতি খায়রুল হকের মতো বিচারব্যবস্থাকে ধ্বংসকারী ব্যক্তিও স্বীকার না করে পারেননি।

অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও সংক্ষেপে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা, ৭ নভেম্বর দেশ রক্ষা এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী দর্শন– একসঙ্গে এরকম তিনটি যুগান্তকারী অবদান অন্য কোথাও দৃশ্যমান নয়। আর এখানেই জিয়ার অনন্যতা, এখানেই তিনি যুগন্ধর, যুগনায়ক।

www.nagorikpathagar.org

মাত্র পাঁচ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই জিয়া চিরকাল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের আলোকে উজ্জ্বল সূর্যের মতো বিরাজ করবেন।

স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিব ও শাসক শেখ মুজিবের মধ্যে ব্যবধান সুমেরু-কুমেরুতুল্য। সিরাজ শিকদারসহ ৩০ হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হত্যার দায় তিনি এড়াতে পারেন না। তাঁর রাজত্বকালে ১০ লাখ মানুষ না খেয়ে মরেছে। তিনি চারটি বাদে দেশের সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় গঠন করেছিলেন একদলীয় 'বাকশালী' শাসন। ফারাক্কা বাঁধ চালুর দায় কিছুটা হলেও তাঁর ওপর পড়ে। তিনি ২৫ সালা চুক্তির মাধ্যমে দেশকে ভারতের পদতলে রেখে যান। শাসক শেখ মুজিবের ঘাড়ে এই ব্যর্থতার দায় পড়বেই।

তারপরও বলব, আওয়ামী লীগের 'চোরের দল', 'চাটার দল' দিয়ে শেখ মুজিবকে বিচার করা ভুল হবে। এ সবকিছু দিয়ে তার স্বাধীনতার পথ নির্মাণের অবিস্মরণীয় ভূমিকাকে খাটো করার প্রচেষ্টা সংগত নয়।

তেমনি জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কয়েকজন দুর্নীতিবাদ কিংবা রাজনৈতিকভাব অপ্রশিক্ষিত অর্থ ও পেশির মালিকদের দাপট দেখে জিয়ার দর্শনকে বিচার করলে ভুল হবে। বোকার মতো কাজ হবে।

তারচেয়ে আসুন, যার যা প্রাপ্য, যার যা সম্মান তাকে তা প্রাণ উজাড় করে দিই। তাহলে একদিকে যেমন আমরা পাপমুক্ত হব, অন্যদিকে জাতিও স্বস্তি পাবে। বন্ধ হবে অতীতের ডাস্টবিন ঘাঁটাঘাঁটি, স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠবে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, যাত্রা হবে প্রত্যাশামাফিক।

সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ৩০ মে ২০১১

www.nagorikpathagar.org

জ্যোতির্ময় জিয়া এবং কালো মেঘের দল

এক

এখন থেকে ৮০ বছর আগে বরিশালের কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই–প্রীতি নেই–করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি–
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

আশ্চর্যের বিষয়, ৮০ বছর আগে লেখা এই কবিতার একটি বর্ণও পুরনো হয়নি। এখনও তা সমান প্রযোজ্য বাংলাদেশের জন্য। বিশেষ করে গত ২ বছরে আওয়ামী লীগ পরিচালিত মহাজোট সরকার যেসব কীর্তিকলাপ করেছে দেশ ও জনগণের প্রতি, বিরোধী দলের প্রতি যেসব আচার-আচরণ করেছে তা দেখে এই কবিতার কথাই ঘুরেফিরে আসে।

সত্যি তো যারা অন্ধ তারাই আজ রাষ্ট্রযন্ত্রের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি চোখে দেখে। যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, নেই মানবিকতার লেশমাত্র চিহ্ন, বাংলাদেশ যেন তাদের সুপরামর্শ ছাড় আজ অচল! যারা দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসে, ভালোবাসে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সম্প্রীতি, সমঝোতা, মঙ্গলবোধকে, সুস্থতা ও সৌন্দর্যকে, শান্তি ও শৃঙ্খলাকে, নীতি, নিয়ম ও নৈতিকতাকে–শেয়াল ও শকুনের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়। সত্যি অশুভ শক্তির দাপটে স্তব্ধ আজ বাংলাদেশের বিবেক। পেশিবাজ, অর্থবাজ ও ক্ষমতাবাজদের দখলে চলে গেছে সবকিছু। সাধারণ মানুষ নিদারুণভাবে নিপীড়িত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে। প্রতিকারহীন শক্তির দম্ভের নিচে চাপা পড়ে বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদছে।

www.nagorikpathagar.org

সত্যি ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দিনদের অবৈধ সরকারের হাত ধরে যে আঁধার নেমে এসেছে জাতীয় জীবনে, সেই আঁধার অপসারণের বদলে আরও বেশি বেশি ঘনীভূত করে তুলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। তারা বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আরও সুদৃঢ় করার বদলে দেশকে নিক্ষেপ করেছে বিভেদ, হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিশোধ ও দুর্নীতির গহ্বরে।

তাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য দেশকে আরেকটি পলাশিতে ঠেলে দেওয়া। দেশকে আর একটি বসনিয়ায় পরিণত করা। গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে এদেশকে বিকৃত-বিকলাঙ্গ পরমুখাপেক্ষী করে ভারতীয় আধিপত্যবাদের পায়ের কাছে ছুড়ে দেওয়া। জাতির আত্মপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিনাশ করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে, ভারতীয় উপপত্নী হয়ে থাকা। তখন হয়তো প্রেসিডেন্টের জায়গায় বসবে রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী হবেন মুখ্যমন্ত্রী, দেশ হবে রাজ্য। 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-এর স্থান নেবেন রামরাজ্যের প্রবক্তা 'মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধী'। বেগম রোকেয়ার ওপর স্থান নিবেন ভগ্নি নিবেদিতা। শাকিব খানকে ধাক্কা মেরে জাঁকিয়ে বসবেন শাহরুখ খান।

আধিপত্যবাদ ও তাদের তাঁবেদারদের এই আত্মঘাতী নীলনকশা বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক শহিদ জিয়াউর রহমান। জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন, উন্নয়নের রাজনীতি এবং তার ইমেজ। তারা খুব ভালো করে জানে, জিয়ার ইমেজ কালিমা মলিন করা না গেলে বাংলাদেশকে মলিন করা যাবে না। জিয়ার রাজনৈতিক দর্শনকে পরাজিত করা না গেলে বাংলাদেশকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। জিয়ার চেতনাকে গুঁড়িয়ে না দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে বরবাদ করা সম্ভব নয়।

এজন্যই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সব ধরনের হিংস্রতা ও ইতরতাকে একত্রিত করে, সংগঠিতভাবে জিয়া উচ্ছেদে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে সরকার। জিয়ার দর্শনকে ধ্বংস করার পথে আবার সবচেয়ে প্রতিবন্ধক জিয়া পরিবার ও বিএনপি। এজন্য বেগম খালেদা জিয়াকে হেনস্তা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সরকার। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে বইয়ে দেওয়া হয়েছে অপপ্রচারের বন্যা। মতলবি অপপ্রচারের গোয়েবলসীয় কায়দায় জাতির কান ঝালাপালা করে দেওয়া হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেনি। তারপরও জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে রাগ কমছে না।

www.nagorikpathagar.org

দল হিসেবে বিএনপিকে সহ্য করতে হচ্ছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। দলের নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে বিরামহীন অত্যাচার-নির্যাতন। ক্ষেত্রবিশেষে হত্যা করা হচ্ছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লুট করা হচ্ছে সম্পদ। হামলা-মামলায় জেরবার লোকজন।

দুই

চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া এই ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের নোংরা ছোবল থেকে জাতীয় নেতারাও আজ পার পাচ্ছেন না। শেরেবাংলা এখন নিদারুণভাবে উপেক্ষিত। মওলানা ভাসানীকে বলা হচ্ছে পাকিস্তানের চর। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানীর নাম নেওয়ারও সাহস পাচ্ছেন না কেউ। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে ব্যক্তিত্ব আক্রান্ত হয়েছেন তিনি শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের নানা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা কম করেও ৩০ লাখ বার জঘন্য ও কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছে এই মানুষটির ওপর। পাঠ্যবই, বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, স্টেডিয়াম, উদ্যান, শিল্প-কারখানা–যেখানেই হোক, অন্ধ-উন্মত্ত হৃদয়হীন, হিতাহিত বোধশূন্য ক্রুদ্ধ দানবের মতো জিয়ার নামের ওপর চালিয়েছে হাতুড়ি, শাবল, গাইতি ও বুলডোজার।

এখন চলছে শিষ্টাচার ও সভ্যতাবর্জিত বিপুল বিশাল ভয়াল জিঘাংসা ও আক্রোশ মেশানো চোয়ালবাজি। মন্ত্রী, পাতিমন্ত্রী, সিকিমন্ত্রী সবাই তারস্বরে চিৎকার করে জিয়ার চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করছেন। এদের কেউ কেউ বলছেন, জিয়া কীসের মুক্তিযোদ্ধা, জিয়া মুক্তিযুদ্ধ করেনি, স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে তাকে বাধ্য করা হয়। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের চর। কেউ কেউ এমনও বলছেন, জিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু মন থেকে মুক্তিযুদ্ধ করেননি। জিয়া স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন করেছেন ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগের এই নেতাকর্মীদের অতীত ইতিহাস কী? কোন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন তারা? কোন মাজারের আউলিয়া তারা? কোথায় কবে কখন কীভাবে তারা মারেফত হাসিল করে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলেন, সেসব বাছবিচার না করে এসব অশ্রাব্য, অশ্লীল ও শিষ্টাচারবর্জিত বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে, তাদের ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা, তাদের আঁচলে আশ্রয় পাওয়া রাজনৈতিক এতিমগুলো পর্যন্ত বলছেন, জিয়া ছিলেন জাতীয় বেইমান। জিয়া ছিলেন হত্যাকারী। দেখাদেখি একদল সুবিধাভোগী,

www.nagorikpathagar.org

গৃহপালিত কলমবাজও যাচ্ছেতাই ভাষায় যা খুশি তা-ই লিখে বাহবা নিচ্ছে আধিপত্যবাদের।

আজকের আওয়ামী লীগের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আধুনিক স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্থপতি, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতা বিপ্লবের নায়ক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শহিদ জিয়া সম্পর্কে এসব কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য–স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে শুনতে হবে ভাবা যায়? ভাবা না গেলেও এসব দেশবাসীকে শুনতে হচ্ছে।

রামমোহন রায় বলেছিলেন, 'পাষণ্ডপীড়নে' দরকার উপযুক্ত 'পথ্য প্রদান'। বিএনপির নেতা-কর্মীদের কাপুরুষতা কিংবা তাদের গায়ের চামড়া গন্ডার দ্বারা নির্মিত হওয়াতেই বোধ করি ক্রমাগত ছাড় দিয়ে যাচ্ছে। তাদের পাশাপাশি দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশ ভয়েই হোক কিংবা নোংরা পানিতে নামতে অনীহার কারণেই হোক, মাঠ ছাড়া।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি নজরুলের বিরুদ্ধেও তাদের জীবিতকালে একদল তথাকথিত সাহিত্যসেবী বিষোদ্‌গারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়ের পর কলকাতার সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল : "বিস্ময়ের কথা এই যে, দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্র-প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন! কোন কোন সুধী এই জগৎব্যাপী কবি জরিপের সার্ভেয়ার ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।"... ... "ভেল্কী জগতে চিরদিন টিকে না। মানুষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভেল্কিবাজীও চিরকালের জন্য অবসানপ্রাপ্ত হয়। আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের প্রভাব শুধু তাহার জীবনকাল পর্যন্ত। অতঃপর আবার বাংলা সাহিত্যে নবযুগের উদয় হইবে।"

নজরুল সম্পর্কে বলা হয়েছিল তিনি হুজুগের কবি। যুগের হুজুগ কেটে গেলে নজরুলের সাহিত্য কেউ পাঠ করবে না। বলা হয়েছিল, নজরুল হলেন প্রতিভাবান বালক। তার চিৎকার-চ্যাঁচামেচি সাহিত্য নয়।

অতিষ্ঠ ও অস্থির হয়ে এসব বিদ্বিষ্ট নিন্দুকের বিরুদ্ধে কলম ধরেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তার লেখার শিরোনাম ছিল 'কুক্কুরের প্রতি' :

'চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রবাদ,
কুক্কুর চিৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি।

www.nagorikpathagar.org

আজি এ কলির শেষে অপরূপ একি–
কুক্কুরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ।

চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুক্কুর কি হইল পাগল?

ভাসিছে 'নবীন রবি' নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুক্কুরের পরান বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গুল খানি উর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া।

তবু তো রবির আলো ম্লান হলো নাহি,
নাহি হলো অন্ধকার জগতের হিয়া!
হে কুক্কুর ঘোষ কেন আক্রোশ নিষ্ফল?
অতি উর্ধ্বে পৌছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল?'

নজরুল তার নিন্দুকদের প্রতি অতটা কঠোর ভাষায় না হলেও, লেখেন :

'তিনতিড়ি গাছে জোনাকী দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল।'

এসব সময়োচিত এবং যথোপযুক্ত জবাব পাওয়ার পর বাংলা সাহিত্যের 'বন্যরা' লা জবাব হয়ে গিয়েছিল। তবে তাদের ঘেউ ঘেউ কোনোদিন থামেনি। তা না থামুক। ইতিহাস কী বলে? ইতিহাস তো ওইসব নিন্দুকের জায়গা দিয়েছে ডাস্টবিনে। আর রবীন্দ্রনাথ-নজরুল স্ব-স্ব মহিমা নিয়ে জাতির মর্যাদা ও সম্মানের আকাশে আজও পতপত করে উড়ছেন। ইতিহাস তাদের নায়কের মর্যাদা দিয়েছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের সৃষ্টিশীল ও মননশীল জগতের বাসিন্দারা প্রভাতকুমার কিংবা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের মতো দায়িত্বশীল নন। নইলে রাজনীতির পাটাতন ছেড়ে এই 'অদ্ভুত অন্ধকারের' জীবরা এতদিনে পলায়ন করত।

তিন

এসব লোকজনের জিয়া-বিদ্বেষের কারণ আমরা আলোচনা করেছি। দেখার বিষয় এরা কারা? মরহুম শেখ মুজিব তো এদের সম্পর্কেই বলেছিলেন, 'চাটার দল', 'চোরের দল'। এরা উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গুম, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, লাইসেন্সবাজি, চোরাচালান, পারমিটবাজি, দখলবাজি,

www.nagorikpathagar.org

চাঁদাবাজির মতো জঘন্য অপকর্মে। দেশে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল নৈরাজ্যের। ব্যথিত-ক্ষুব্ধ শেখ মুজিব তার এসব 'সোনার ছেলেদের' সৎপথে-সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য খান আতাউর রহমানকে দিয়ে নির্মাণ করান বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'আবার তোরা মানুষ হ'। এরা মানুষ হওয়ার পথে ফিরে না আসায় ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ নেতা নিষিদ্ধ করে দেন আওয়ামী লীগ। অনেকটা ত্যাজ্যপুত্র করেন এই আপদগুলোকে। গড়ে তোলেন বাকশালের মতো খিচুড়ি। এতে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ বঞ্চিত আওয়ামী লীগেরই একটা অংশ সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারের সহায়তায় নির্মমভাবে খুন করে শেখ মুজিবকে। গ্রহণ করে প্রতিশোধ। তারপর নেতার লাশ সিঁড়িতে ফেলে রেখে এরা বঙ্গভবনে দৌড়ায় নতুন সরকারে শপথ গ্রহণ করার জন্য। এদের বিরাট অংশ এখন মাননীয় প্রধামন্ত্রীর আশেপাশে।

সত্যিকারের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন আওয়ামী নেতা ও কর্মীদের অনেকেই এখন ক্ষমতার বলয়ের বাইরে। এই ফাঁকে আওয়ামী লীগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে বসে গেছে উচ্ছিষ্টভোগী-সুবিধাভোগীরা। এদের মধ্যে অনেকেই এখন বিরাট কর্তা। এরা শেখ মুজিবের চাইতেও বড় আওয়ামী লীগার সেজে বসেছে। অথচ এরাই শেখ মুজিবের নাম কুটি কুটি ছিঁড়ে করে রাস্তায় ফেলে পদদলিত করেছিল। দাবি করেছিল শেখ মুজিবের ফাঁসি। এরা বিলুপ্ত প্রজাতি মস্কাইডদের অপভ্রংশ। প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান।

আওয়ামী লীগে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা আরও আছে। শেখ মুজিবকে খুনি, স্বৈরশাসক ছাড়া যারা সম্বোধন করত না, জাতীয় পার্লামেন্টকে যারা 'শুয়োরের খোঁয়াড়' বলে উল্লেখ করত, যাদের অনেক নেতাকর্মী নিহত হয়েছে রক্ষীবাহিনীর হাতে, আবার আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও কর্মীর রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত, হঠকারী 'বৈদ্যুতিক সমাজতন্ত্রের' ধ্বজাধারী সেই বাতিল মালগুলোও এখন আওয়ামী লীগের ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো চেপে বসেছে।

আওয়ামী লীগ তাদের 'ঘোষণাপত্র' অনুসারে অগণতান্ত্রিক শক্তি নয়। তবে পরিষ্কারভাবে বলা যায়, এসব রাজনৈতিক ফকির, হাড়-হাভাতে, এতিম, আগাছা-পরগাছাই আজ আওয়ামী লীগকে দিয়ে নৃশংস ফ্যাসিস্ট কায়দায় নানা অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ও অবৈধ কর্মকাণ্ড করাচ্ছে। তারাই ভেতর থেকে আওয়ামী লীগকে ফোঁপরা করে দিচ্ছে। তৈরি করছে কোলাহল, কদর্য-কুৎসিত নৈরাজ্য। এরাই নিজেদের নোংরা চেহারা আড়াল করার জন্য অতিমাত্রায় চিৎকার করে পাড়া মাথায় নিয়েছে। এসব পরগাছাই জ্যোতির্ময় জিয়ার বিরুদ্ধে ছড়াচ্ছে বিষ ও বিদ্বেষ।

www.nagorikpathagar.org

এদের সমস্ত জীবন ও অবদান একত্র করে ওজন নিলেও শহিদ জিয়ার এক পাটি জুতার সমান যে হবে না, একথা এরা ভালো করেই জানে। জিয়াকে অতিক্রম করা যায় না। জিয়া যে তাদের মতো অন্তঃসারশূন্য বেলুন ছিলেন না–এটাও তাদের ক্রোধের অন্যতম কারণ।

নির্বাচন নির্বাচন খেলাতে এরা হয়তো কখনও কবজা করে সিংহাসন। কিন্তু মানুষের মনের মণিকোঠার সিংহাসন লাভ যে দশবার জন্ম নিলেও হবে না, তা এরা জানে। সেজন্য আধিপত্যবাদের কাছে হৃদয় বন্ধক দিয়ে হলেও জিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের ব্যর্থতার ঝাল মেটায়। এসব অশান্তিকামী কপট, বর্ণচোরা, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সম্পর্কে নজরুল বলেছেন :

> "অশান্তিকামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,
> অবশেষে চির লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে!
> পথের ঊর্ধ্বে উঠে ঝড়ো বায়ে পথের আবর্জনা
> তাই বলে তারা ঊর্ধ্বে উঠেছে– কেহ কভু ভাবিও না!
> ঊর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদেরি পথে হয় এরা বাধা;
> পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় নাকো কাদা!"

চার

দেশের মানুষের সর্বশেষ আশা-ভরসার স্থল সর্বোচ্চ বিচারালয়কেও এই সরকার নানা কায়দায় টেনে নামিয়েছে বিতর্কের কেন্দ্রে। ঘটনা যাই ঘটুক, দেশের মানুষ এখনও বিচারালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে চায়। সেই বিচারালয়কেও নানা উছিলায় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য মরিয়া বর্তমান সরকার। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। সেজন্য সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে সরকারের কুপ্রবৃত্তি। মনে রাখতে হবে, এরাই সর্বোচ্চ আদালতকে অপমান করার জন্য, তুচ্ছ করার জন্য ঝাড়ু মিছিল করেছিল। সেজন্য সর্বোচ্চ আদালতকে আমাদের দৈনন্দিন তোলপাড়ের ঊর্ধ্বে রেখে কথা বলাই ভালো। ভেবে দেখতে হবে, আদালতের এখতিয়ারবহির্ভূত বিষয়গুলো কেন আদালত কক্ষে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা কোনো আদালতের রায়ে আসেনি। স্বাধীনতা এসেছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে। কোনো মাননীয় কিংবা মহামান্য বিচারপতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণও করেননি। করার কথাও হয়তো নয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু কিংবা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার প্রিয় সন্তান সৈনিক জিয়া। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

সংগত কারণেই কে স্বাধীনতার ঘোষক, কে নয়– নির্ধারণের ভার ঐতিহাসিকদের, গবেষকদের, মুক্তিযোদ্ধাদের, বাংলাদেশের জনগণের। এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে এ নিয়ে আদালতকে যদি কেউ ব্যবহার করতে চায়, তাহলে মহামান্য আদালত তা গ্রাহ্যে আনবেন কেন? এভাবে জিয়ার অবদানকে খাটো করা অন্যায় হবে। এভাবে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত জিয়ার ভাবমূর্তি নষ্ট করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া আদালতের রায় দিয়ে জাতীয় বীর বা জনগণের নায়ক বানানো যায় না। কাউকে বাতিলও করা যায় না। এর পেছনে থাকে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণ।

পাঁচ

এই যে বাংলাদেশ বিরোধী, জিয়াবিরোধী অপতৎপরতা, এর মোকাবিলায় জাতীয়তাবাদী শক্তির ভূমিকা কী? বিশেষ করে বিএনপির ভূমিকা হতাশাজনক। মনে হয় বিএনপি ফারসি সাহিত্যের অমর কবি শেখ সাদীর সেই নীতি কবিতাকেই মোক্ষ মেনেছেন–

"কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কি কুকুরে কামড়ানো
মানুষের শোভা পায়।"

–তো সেজন্যই হয়তো বিএনপি কুকুরকে রবীন্দ্রসংগীত শোনাচ্ছেন। শোনাচ্ছেন মকছুদুল মুমিনিন।

কিন্তু একটু আগাপাছতলা ভাবলেই ধরতে পারত, কুকুরকে কামড়ানো মানুষের কাজ নয় সত্যি; কিন্তু কুকুরকে লাঠৌষধি প্রয়োগে তো কবি নিষেধ করেননি। তা প্রয়োগে সমস্যা থাকলে অন্তত দেখানোর কাজটা তো করা যেত।

ছয়

স্টিভেনসনের কালজয়ী সৃষ্টি 'ডা. জেকিল ও মি. হাইড'কে মনে পড়ে? মনে কি পড়ে তার অমর চরিত্র ডা. জেকিলকে? সদাশয় ডাক্তার জেকিলের দেহ ও মনের মধ্যে হিংস্র পশু মি. হাইডের আবির্ভাব হলো। প্রথম দিকে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি প্রায় সমানে সমানে থাকলেও, যত দিন যায় ডা. জেকিলকে ক্রমে গ্রাস করে ফেলে হাইডের কালো ছায়া। অবশেষে একদিন হাইডের কবল থেকে আর মুক্তি পেলেন না জেকিল–সেদিন দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যার পথই বেছে নিলেন ড. জেকিল।

www.nagorikpathagar.org

এই গল্পটা খানিক বয়ান করলাম সরকারি দল আওয়ামী লীগের দিকে তাকিয়ে। আমার মতো অনেকেরই ধারণা, ডা. জেকিলের মতোই আওয়ামী লীগের দেহ ও আত্মার মাঝে ঢুকে পেড়েছে মি. হাইডরা। এই হাইডদের কি সাচ্চা আওয়ামী লীগাররা প্রতিরোধ করতে পারবেন? আমরা কায়মনোবাক্যে চাই, আওয়ামী লীগ এই শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বে বিজয়ী হোক। নইলে তো ইতিহাস তাদের ডা. জেকিলের পরিণতির কাছে নিয়ে যাবে।

সাত

আওয়ামী লীগের ভেতর লুকিয়ে থাকা আধিপত্যবাদের চাকর-বাকররা, জিয়াবিদ্বেষীরা যত ঘৃণ্য পথই বেছে নিক–তারা জিয়াউর রহমানকে মুছে ফেলতে পারবে না। অন্ধকারের ঘৃণা অন্ধকারের বাসিন্দাদেরই পরাজিত করে। আলোর নায়ককে তারা কোনোদিন স্পর্শ করতে পারে না। সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি কিংবা সজনীকান্ত দাশরা শত চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের মহিমাকে সামান্যতম ম্লানও করতে পারেননি। এরাও জিয়ার ইমেজ ও রাজনীতির কাছে খলনায়ক হিসেবেই চিহ্নিত হবে চিরদিন। তবে একদিকে এরা নিজেদের অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জিয়া-বিদ্বেষের পোষক, নিন্দুক ও কুৎসা রটনাকারীরূপে এরা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরা জ্যোতির্ময় জিয়ার পিছু পিছু চলবে চিরকাল, যেমনটি চলে আলোর পেছনে কালো ছায়া।

সত্যি বলছি, জিয়ার সঙ্গে এরাও ইতিহাসে স্থান পাবে, যেমনভাবে দেবী দুর্গার পায়ের নিচে জায়গা পেয়েছে মহিষাসুর। জিয়ার মাজার জিয়ারত করতে আসা দেশপ্রেমিক জনতা, চিরদিন হজের সময় শয়তানকে পাথর ছোড়ার মতো বিরক্তির করুণা ছুড়ে মারবে এদের দিকে। আর বিদ্বেষ ও ঘৃণার উর্ধ্বে উঠে শহিদ জিয়ার স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য গ্রহণ করবে শপথ

সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ১৯ জানুয়ারি ২০০১

www.nagorikpathagar.org

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাদান অভিলাষ : জিয়া উচ্ছেদ প্রকল্প

এক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপিকে শিক্ষা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনার যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন, সেই অবস্থান থেকে এ রকম একটি উদ্যোগ তো তিনি নিতেই পারেন। যুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের ভাষা যাই হোক, প্রধানমন্ত্রী যে সেসব খুব একটা তোয়াক্কা করেন তা বলা যাবে না।

১৯৯৬-২০০১ এ তার প্রধানমন্ত্রিত্বের ১৮২৫ দিনের মধ্যে, ৬ লাখ ৫০ হাজার কিলোমিটার পথ আকাশে উড়ে, ৫০টি বিদেশ সফরে ২৪৮ দিন কাটিয়ে যে ১০টি অতি উন্নত জাতের 'ডক্টরেট' ডিগ্রি তিনি অর্জন করেছিলেন, তার 'গরমে' এখন তিনি যদি 'ডক্টরেট' বিহীন বিএনপিকে কিছু শিক্ষা দিতে চান তাহলে তো আর তাকে দোষ দেয়া যায় না।

বিদ্যা আর আগুন তো চেপে রাখার জিনিস নয়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উত্তেজিত হয়ে তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রিয় আমলা এবং ১৫ আগস্টের পর মোশতাকের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী এইচটি ইমাম পর্যন্ত বলে বসেছেন, বিএনপিকে থেরাপি দেওয়া হচ্ছে (মি. ইমাম যে থেরাপি বিশেষজ্ঞ এদ্দিন আমরা জানতাম না)।

প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে যে শিক্ষা দিচ্ছেন বা যে প্রকল্পের আওতায় কাজটি করছেন, সেই প্রকল্পের একটা নাম আমরা অনায়াসেই দিতে পারি। যদিও প্রধানমন্ত্রী তার শিক্ষাদান কর্মের কোনো শিরোনাম এখন পর্যন্ত দেননি। তো 'এই মহৎ কর্মকাণ্ডের যে আলো' আমাদের ওপর পতিত হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে হিংসা, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিভেদ, জিঘাংসা, আক্রোশ, হানাহানি, অশান্তি, অসহিষ্ণুতা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও প্রতিশোধ। আবার এসব 'মহাগুণাবলি'র আঘাত গোর্কি বা সিডরের মতো ভয়াবহতা নিয়ে যে মানুষটির ওপর হামলে পড়ছে তার নাম শহিদ জিয়াউর রহমান।

www.nagorikpathagar.org

দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' রাষ্ট্রদর্শনের প্রবক্তা, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা। তো পাঠ্যবই, বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, স্টেডিয়াম, উদ্যান, শিল্প কারখানা–যেখানেই হোক না কেন, অন্ধ, উন্মত্ত, হৃদয়হীন, হিতাহিত বোধশূন্য ক্রুদ্ধ দানবের মতো জিয়াউর রহমানের নাম, কলম, হাতুড়ি, শাবল, গাইতি ও বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ করে, ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ওয়াদা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত দেশ, ভিশন-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, দিনবদলের রাজনীতি, ১০ টাকা সের চাল, ঘরে ঘরে চাকরি, বিনামূল্যে সার, দ্রব্যমূল্যের লাগাম টানা, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, দখলবাজ, সন্ত্রাস দমন, শিল্পায়ন, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ–সব শিকায় তুলে মহাজোট সরকারের এখন যেন একটাই কাজ–যেখানে, যেভাবে, যত তাড়াতাড়ি পারো জিয়াউর রহমানের নাম উচ্ছেদ করো। মুছে দাও। ধ্বংস করো। নিশ্চিহ্ন করো। যেন বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় এখন চেঙ্গিস খান, হালাকু খান কিংবা জর্জ বুশের মতো মানসিক বিকারগ্রস্ত কোনো রক্তপিপাসু। সম্প্রীতি, সমঝোতা, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, ন্যায়নীতি, সভ্যতা, সামাজিক মূল্যবোধ– এগুলো যেন এদের কাছে বাদাম খোসার চাইতেও হালকা কিছু। এই ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞের মহাজোট সরকারকে মহা উৎসাহে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে তাদের অনুগ্রহ ভিখারি, খুদ-কুঁড়োভোগী একশ্রেণির সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এবং 'সুশীল' বুদ্ধিজীবী। আর এর মাধ্যমে বিরোধী দলকে উচ্ছেদ, দমন, পীড়নের মাধ্যমে দৌড়ের ওপর রেখে রাষ্ট্রের আসল সমস্যা নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

তো প্রধানমন্ত্রীর এই একরৈখিক এবং একমুখী শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার একটাই নাম হতে পারে, 'জিয়া উচ্ছেদ প্রকল্প'। আর এই প্রকল্পের সাফল্যের পরই যেন নির্ভর করছে তার দিনবদল ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সাফল্য।

দুই

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত শিক্ষার মহিমা কীর্তনের আগে, জিয়া উচ্ছেদ প্রকল্পের রহস্য উদ্‌ঘাটন জরুরি বলে মনে হয়। কারণ অনেকেই প্রশ্ন করেন, হঠাৎ করে জিয়া উচ্ছেদের নামে এই বিভীষিকাময় তুঘলকি কাণ্ড কেন? জিয়ার প্রতি তারা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন কেন? গায়ে বিচুটির পাতা লাগার

www.nagorikpathagar.org

মতো জ্বালা ধরে কেন? সাধারণের এই জিজ্ঞাসা পূরণের জন্য শাসকরা যা বলছেন তা একেবারে নোংরা, কুৎসিত 'ইতরজনোচিৎ'। সেগুলো দিয়ে গায়ের ঝাল মেটে, যৌক্তিক আলো পাওয়া যায় না।

অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত সেসব স্ল্যাং-এর স্রোতে গা ভাসানো আমাদের যোগ্যতায় কুলাবে না। আমরা পর্যায়ক্রমে এর যৌক্তিক কারণগুলো পরিষ্কারভাবে দেখাতে চাই। আসলে বর্তমান মহাজোট সরকার বা আওয়ামী লীগের জিয়া বিদ্বেষ হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা জিনিস নয়। অন্যবার সরাসরি আধিপত্যাবদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না বলে বিষয়টা অতটা প্রকটভাবে চোখে পড়েনি। কিন্তু এবার পর্দার আড়াল বলে কিছু নেই। ফলে আঘাতগুলো হচ্ছে নির্বিচারে এবং উন্মত্ততার সঙ্গে। ঠিক যেভাবে লেন্দুপ দর্জির হাতে ঝলসানো হয়েছিল চোগিয়াল পরিবারকে, যেভাবে ম্যাসাকার চালানো হয়েছে পিলখানায়।

বিদ্বেষ–এক : দেশকে দেশের মানুষকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত, রক্তাক্ত, দিকনির্দেশনাহীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় রেখে প্রধান নেতা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান আত্মসমর্পণ করলেন পাকিস্তান বাহিনীর কাছে। বাকিরা পৈতৃক প্রাণ নিয়ে সীমান্ত টপকে পালালেন ইন্ডিয়াতে। সাধারণ নেতা-কর্মীদের কথা আলাদা। কিন্তু নেতৃত্বের বিরাট অংশ যে যুদ্ধ চায়নি, চেয়েছিল পাকিস্তানি ফ্রেমের মধ্যে সমাধান, তা বলাই বাহুল্য (৭ মার্চের ভাষণ ও ২৩ মার্চ বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। এজন্যই বর্তমান আওয়ামী মন্ত্রী, সাবেক এরশাদ সরকারের প্রিয় মন্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধা একে খন্দকার বলতে বাধ্য হন, ২৩ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কোনো ধরনের প্রস্তুতিই ছিল না (মুক্তিযুদ্ধ পূর্বাপর)।

সেই ঘোর সংকটে, প্রকৃতি প্রদত্তভাবেই যেন আলোকবর্তিকার মতো আবির্ভূত হন জিয়াউর রহমান। রাজনীতিবিদরা যখন ভূলুণ্ঠিত, সেই সময় জাতির স্বাধীনতার স্পৃহার নিশান উঁচু করার দায়িত্ব নিলেন জিয়া। তিনি ২৫ মার্চ রাতেই করলেন বিদ্রোহ। ২৭ মার্চ ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা। কবি বেলাল মোহাম্মদের ভাষ্য অনুযায়ী আরও অনেকে হয়তো এ ধরনের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো জাতীয় বা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রাহ্য হয়নি–কারণ তারা সবাই ছিলেন 'মাইনর'। অতএব একজন 'মেজর'-এর ঘোষণাই জাতি বা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রাহ্য হয়, গৃহীত হয়। ড. এ. আর মল্লিক কিংবা এ. কে. খানের মতো ব্যক্তিত্বদের অনুরোধেই যে জিয়া মরহুম মুজিবের নামে পরের ঘোষণাগুলো দিয়েছিলেন তাও সত্য। কারণ বলার অপেক্ষা রাখে না, শেখ মুজিব নিঃসন্দেহে তখন অবিসংবাদিত

www.nagorikpathagar.org

নেতা–জনগণের নির্বাচিত নেতা। তার নামে ঘোষণা না দিলে তা সেনা বিদ্রোহ হিসেবে দেখানোর সুযোগ নিত পাকিস্তান।

এই একটি মাত্র ঘোষণা জাগিয়ে দিল জাতিকে। জাতি পেল পথ নির্দেশনা। ভেতরে যাই থাক, পলাতক আওয়ামী নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হলো প্রবাসী সরকার গঠনে, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে। এই একটি মাত্র ঘোষণা পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল সেদিন। এইভাবে জিয়ার কাছে চিরকালের জন্য ছোট হয়ে আছে আওয়ামী নেতৃত্ব। এটাকে উদার ও সহজভাবে তারা কোনো দিন মেনে নিতে পারেনি।

বিদ্বেষ–দুই : ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর আধিপত্যবাদের নীলনকশা ভণ্ডুল করে দেয় সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সৈনিক ও বীর জনগণ। অভূতপূর্ব এক সিপাহি জনতার বিপ্লবের জন্ম দিয়ে তারা যেমন দেশকে রক্ষা করে, তেমনিই জাতীয় চেতনার আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হন জিয়াউর রহমান। ১৬ ডিসেম্বরের অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করে দেশ যেন সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয়ে ওঠে। '৭৫-এর ১৬ আগস্টের আগের পর্যায়ে দেশকে পিছিয়ে নেওয়ার আওয়ামী আয়োজন ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ এর জন্য জিয়াউর রহমানকে কোনো দিন ক্ষমা করেনি।

বিদ্বেষ–তিন : এ কথা সবাই জানে, বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিব শাসক হিসেবে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। আজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে, ক্ষমতা হাতে নিয়েই তিনি প্রথম আঘাত হানেন গণতন্ত্রের ওপর। সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে গঠন করেন একদলীয় 'বাকশাল' স্বৈরতন্ত্র। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি বাদে সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৭ জানুয়ারি লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখল, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।" ...শেখ মুজিব এমপিদের বললেন, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে ঔপনিবেশিক ও দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী বলে অভিযুক্ত করেন।... নতুন প্রেসিডেন্টের যে আদৌ প্রশাসনিক জ্ঞান নেই তা গত তিন বছরে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

তার স্টাইল হচ্ছে ডিকটেটরের স্টাইল। ...একদলীয় শাসন সৃষ্টির ফলে দুর্নীতি দূর না হয়ে বরং বাড়তে থাকবে। কেননা, উদ্ধত আওয়ামী লীগারদের 'চেক' করতে পারবেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তিনি থাকবেন অতিরিক্ত কাজের চাপে।' আওয়ামী বাকশালী দুঃশাসনের ১৩৩৮ দিনের

www.nagorikpathagar.org

সীমাহীন অপকীর্তির সঠিক সংখ্যা, পরিমাণ ও ব্যাপকতা একনজরে তুলে ধরা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ, সে সময় সব কীর্তিকলাপ সংবাদপত্রে তুলে ধরা সম্ভব ছিল না। কারণ বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকায়, লাগামহীন লুণ্ঠন, ব্যাংক ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, পাটের গুদামে আগুন, দখল, সন্ত্রাস, চোরাচালান ইত্যাদির কাছে সমাজের সবাই হয়ে পড়েছিল অসহায়।

তারপরও সেই সময়কার দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সোর্সের তথ্য অনুযায়ী একটা সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান দেওয়া যায় : দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করেন ১০ লাখ মানুষ। পুষ্টিহীনতায় মৃত্যুবরণ করেন ২ লাখ। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় ১ লাখের। জেলখানায় মৃত্যু হয় ৯ হাজার। আওয়ামী বাকশালী গুন্ডা ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে মৃত্যু হয় ২৭ হাজার। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১৯ হাজার। গুম-খুন ১ লাখ। পিটিয়ে মারা হয় ৭ হাজার জনকে।

নির্যাতনে পঙ্গুত্ববরণ করেন ২ হাজার ৬০০। গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হন ২ লাখ। হাইজ্যাক-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে ২২ হাজার। চুরি, ডাকাতি, লুটপাটের ঘটনা ঘটে ৬০ হাজার। আগুন লাগানো হয় ৭২টি পাটের গুদামে। আত্মসাৎ হয় ৫ হাজার কোটি টাকার মালামাল। কালোবাজারি হয় ২ হাজার কোটি টাকার মালামাল। পাচার হয়ে যায় ১০ হাজার কোটি টাকার মালামাল। জালিয়াতির ঘটনা ঘটে ৫ হাজার। ব্যাংক লুট হয় ১৫০টি। অস্ত্র লুট হয় ১৫ হাজার। ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ১৫ হাজার। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর দখল হয় ১৩ হাজার। জমি দখল হয় ৫০ হাজার একর। সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয় ৪ শতাধিক। (টাকার অঙ্কগুলো সেই সময়ের, বর্তমানে এগুলোর মান শতগুণ বাড়াতে হবে)।

এই রক্ত হিম করা লুণ্ঠনের খতিয়ানের সঙ্গে যুক্ত হয় ইন্ডিয়ান লুণ্ঠন। ১৩৩৮ দিনে ইন্ডিয়া ধান, গম, চাল লুট করে ৮০ লাখ টন, সে সময়কার বাজারমূল্য ২১৬০ কোটি টাকা। পাট লুট করে ৫০ লাখ বেল, মূল্য ৪০০ কোটি টাকা। ত্রাণসামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় ১৫০০ কোটি টাকার। যুদ্ধাস্ত্র, আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ, ওষুধ, মাছ, গবাদি পশু, স্বর্ণ-রৌপ্য, তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি লুণ্ঠন করে ১,০০০ কোটি টাকার ওপরে। মোট ৫০৬০ কোটি টাকা। (সূত্র- জনতা মুখপত্র, নভেম্বর, ১৯৭৫)।

এই সীমাহীন অপশাসন, সন্ত্রাস ও লুণ্ঠনের ফলে দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সদ্য মুক্তিযুদ্ধ ফেরত একটি গর্বিত জাতিকে পরিণত করা হয় ভিক্ষুকে। দেশের জন্য উপাধি জোটে ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’র। এরকম

www.nagorikpathagar.org

অবস্থায় জিয়াউর রহমান দেশের শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব পেলেন। তিনি অতি দ্রুততার সঙ্গে দেশে ফিরিয়ে আনলেন আইনের শাসন।

গণতন্ত্রকে কবর থেকে উদ্ধার করে প্রবর্তন করলেন বহুদলীয় গণতন্ত্র। ভিক্ষুকের হাতকে পরিণত করলেন কর্মীর হাতিয়ারে। মাত্র দু'বছর আগে যে দেশে ১০ লাখ লোক না খেয়ে মরেছে, সেই দেশকে তিনি খাদ্যে স্বনির্ভর করলেন। তলাবিহীন ঝুড়ি পূর্ণ হলো প্রাচুর্যে। এবার শুরু হলো খাদ্য রফতানি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতির হারানো সম্মান ফিরে এলো। উন্নয়ন ও উৎপাদনের পথে এগিয়ে চললক আধুনিক বাংলাদেশ। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, শাসক শেখ মুজিব ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আর শাসক জিয়া সত্যিকার অর্থেই সফল। এই পরাজয়কেও আওয়ামী নেতৃত্ব কোনো দিন গ্রহণ করতে পারেনি।

বিদ্বেষ–চার : সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, মরহুম শেখ মুজিব গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন। একজন অনন্য সাধারণ জাতীয় নেতা হয়েও তিনি গণতন্ত্রকে কবরস্থ করতে সামান্য দ্বিধা করেননি। আর ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে জিয়া সেই 'নিহত গণতন্ত্র'কে নতুন করে প্রাণ দেন। পুনরায় প্রবর্তন করেন বহুদলীয় গণতন্ত্র। বিদ্বেষের কারণ এখানেও।

বিদ্বেষ–পাঁচ : বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করে মরহুম মুজিব জাতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলেছিলেন। এমনকি তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদেরও 'বাঙালি হইয়া যাও' বলে নছিহত করেছিলেন। যে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে ধারা তুলে মূল জাতিসত্তাকেও দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছিলেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির জন্য দরকার ছিল জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা। বিভেদ ও হানাহানির এই বিপর্যয় রুখতে জিয়া জাতিকে একটি আত্মপরিচয় দিতে পদক্ষেপ নেন। দেশের মধ্যে বাস করা ধর্ম জ্যোতির্ময় জিয়া সম্প্রদায় হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এবং বাঙালি, চাকমা, মারমা, মুরং, গারো, হাজং, সাঁওতাল, ওঁরাও, ত্রিপুরী, তঞ্চংইগ্যাসহ সব ছোটবড় নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় জাতিসত্তার এক দৃঢ় পাটাতনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর জন্য উপহার দিলেন তার ঐতিহাসিক রাষ্ট্রদর্শন 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'। যা আজ বাংলাদেশের প্রধানতম রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

দেশের ঐক্য ও উন্নয়নের চাকাকে যথার্থভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তিনি সংঘাত, হানাহানি, ঘৃণা ও বিভেদের ধ্বংসাত্মক

www.nagorikpathagar.org

পথ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সমন্বয়ের রাজনীতি চালু করলেন। আর এই প্রক্রিয়াটি যে আধিপত্যাবদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা–তা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এজন্য তারা বারবার আঘাত করছে এ সমন্বয় ও সম্প্রীতির পাটাতনকে নস্যাৎ করতে।

বিদ্বেষ–ছয় : শেখ মুজিব যখন সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে 'বাকশাল' কায়েম করেন, সেই সময় তিনি তার নিজের দল আওয়ামী লীগও 'ব্যান্ড' করে দেন। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তিনি প্রকাশ্য জনসভায় বলেন, সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি। আমি ভিক্ষা করে খাদ্য অর্থ আনি–আর চাটারদল সব খেয়ে ফেলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে খান আতাউর রহমান নির্মাণ করেন বিখ্যাত ছবি 'আবার তোরা মানুষ হ'। মুজিবের প্রত্যাশা অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সেই সময়কার ক্ষমতাসীনরা 'মানুষ' না হলে, ব্যথিত মুজিব তার নিজ দলও নিষিদ্ধ করে দেন।

জিয়াউর রহমানের হাত দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হলে সব রাজনৈতিক দল এই সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নামে সে সময় কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। জিয়াউর রহমান চাইলেন সব দল ও মতের মানুষের সম্মেলনে বহুদলীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের সময়টা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। এ কারণে তিনি আওয়ামী লীগকেও পুনরুজ্জীবন দানের জন্য আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের একটি অংশ স্বয়ং শেখ মুজিবের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ছিল জড়িত। তারা খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে গঠন করে নতুন দল।

কেউ কেউ অন্যান্য দলে ভিড়ে। অবশিষ্ট যারা ছিল, তাদের তিনি ভয় না পেয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। বললেন, একটি মুক্ত অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশের স্বার্থে আসুন অতীতের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে, নতুনভাবে দেশ গড়ার জন্য নিজেদের সবটুকু সামর্থ্যকে একত্রিত করি। বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের একটি অংশ জিয়াউর রহমানের হাত থেকে দল পুনরুজ্জীবনের জন্য আদেশপত্র গ্রহণ করে। নতুন করে জীবন লাভ করে আজকের এ আওয়ামী লীগ। আজকের আওয়ামী লীগ তাই মুজিবের আওয়ামী লীগ নয়। এই দলের বর্তমান অবস্থার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রাণপুরুষ বা স্থপতি জিয়াউর রহমান।

জিয়াউর রহমানের হাত থেকে যে দল গড়ার অনুপ্রেরণা ও আদেশ নিয়ে আওয়ামী লীগকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল, এটাকে গৌরব ও প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে না দেখে জিয়াউর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করার বদলে, আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃত্ব একে নিয়েছে লজ্জা ও অপমান

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে। এখন এই লজ্জা ও অপমানের জ্বালা মেটানোর জন্য 'উপকারীকে বাঘে খায়' শিরোধার্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাবৎ ক্রুদ্ধতা নিয়ে।

বিদ্বেষ–সাত : এটা সবাই জানেন, জিয়াউর রহমানের আগ্রহ, উদ্যোগ ও আয়োজনের জন্যই আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে পেরেছিলেন ১৯৮১ সালের ১৭ মে। জিয়াউর রহমানের সর্বশেষ ভারত সফরের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হাসিনার দেশে ফেরার প্রসঙ্গটি জিয়াউর রহমানের কাছে উত্থাপন করেছিলেন। শোনা যায়, সে সময় ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহে জিয়া-হাসিনার একটি বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকে জিয়া বলেছিলেন, হাসিনা দেশের একজন জাতীয় নেতার কন্যা। তিনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হয়েছেন, দেশে ফেরার তার অধিকার আছে। অবশ্যই তিনি সম্মানের সঙ্গে ফিরবেন। আমি সব ব্যবস্থা করছি। মালেক উকিল, মিজান চৌধুরীর মতো নেতারা হয়তো জ্ঞাত ছিলেন পুরো বিষয়টি। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া বলেছেন, ভারত রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকার সময় '৮১-তে জেনারেল জিয়া বললেন, "হাসিনাসহ দেশে ফিরে আসুন। আপনাদের রক্ষা করতে প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেব। তার আমলেই দেশে ফিরেছি।'

শেষ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের ব্যবস্থাপনায় দেশে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা। আমি জানি না, প্রধানমন্ত্রীর সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ আছে কি না। অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, তার দেশে ফেরার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নির্মমভাবে নিহত হলেন জিয়াউর রহমান। কেউ যদি এখন বলে, হাসিনার দেশে ফেরার সঙ্গে জিয়া হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র আছে, অথবা পরোক্ষভাবে হলেও এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। তাহলে? ধন্যবাদ দিই বিএনপিকে তারা এমন কথা এখনও বলেনি।

আমার ধারণা, জিয়াউর রহমানের জন্যই যে নেত্রী দেশে ফিরতে পেরেছিলেন এই লজ্জা বর্তমান আওয়ামী নেতৃত্বকে নিশ্চয়ই মুহূর্তে মুহূর্তে বিব্রত ও বিরক্ত করে তোলে। হয়তো সেজন্যই এই দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কের ইমেজ ধ্বংসের জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে আওয়ামী লীগ।

বিদ্বেষ–আট : মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দীন সরকারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যই যে এ সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে–তা তো চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিতে হয় না। তো কাজটি হলো, দেশকে আরেকটি পলাশিতে ঠেলে দেওয়া। দেশকে একটি বসনিয়ায় পরিণত করা। দেশে গৃহযুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

লাগিয়ে চিরকালের জন্য এদেশকে বিকৃত, বিকলাঙ্গ, পরমুখাপেক্ষী করে ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির পায়ের কাছে ফেলে দেওয়া। বিভেদ ও হানাহানির মধ্যে লিপ্ত করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনাশ করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিসর্জন দিয়ে, ভারতীয় উপপত্নী বা স্যাটেলাইট হয়ে থাকা। তখন প্রেসিডেন্টের জায়গায় হবে রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী হবেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশ হবে রাজ্য। 'জাতির পিতা'র স্থান নেবেন গান্ধী। হযরত শাহজালালের স্থানে জায়গা হবে শঙ্করাচার্যের। হাজী শরীয়তুল্লাহর স্থানে স্বামী বিবেকানন্দ, বেগম রোকেয়ার উপরে আসন নেবেন ভগ্নি নিবেদিতা। নবাব ফয়জুন্নেসার সিংহাসনে বসবেন তসলিমা নাসরিন। আর আমাদের শাকিব খানকে ধাক্কা মেরে জাঁকিয়ে বসবেন শাহরুখ খান। এই কর্মে এই নীল নকশা বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এখন একটাই, জিয়াউর রহমান। জিয়ার দর্শন, জিয়ার ইমেজ। আধিপত্যবাদের কাছে হৃদয় বন্ধক রেখে জিয়াকে সহ্য করা যায় না। যাবে না মূল এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। কারণ বাংলাদেশের মানুষকে জিয়া শিখিয়ে গেছেন স্বাধীনতা অর্জন, স্বাধীনতা রক্ষার পথ। দিয়ে গেছেন চেতনার জগতে রাষ্ট্রদর্শন। এজন্য বাংলাদেশের মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় তার রয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল উপস্থিতি। বাংলাদেশের মানুষ জানে দুধ থেকে সাদা রংকে আলাদা করা যায় না। দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা করলে দেহ যেমন লাশে পরিণত হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে জিয়ার সম্পর্ক সেরকম।

এ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য, জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে গত ২৯ বছর ধরে কমপক্ষে ২৯ লাখ বার প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য আওয়ামী নেতা বিষোদ্গার করেছেন, করে যাচ্ছেন। সেই বিষোদ্গারও যখন কাজ দিচ্ছে না, হিরোকে ভিলেন বানানোর সব উদ্যোগ ফেল করার ফলে ক্ষিপ্ত শাসকদল এবার নেমেছে ভাঙচুরের পথে।

তারা খুব ভালো করে জানে, জিয়ার ইমেজ কালিমা মলিন করা না গেলে বাংলাদেশকে মলিন করা যাবে না। জিয়ার রাজনৈতিক দর্শনকে পরাজিত করা না গেলে বাংলাদেশকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। জিয়ার অবদানগুলোকে গুঁড়িয়ে না দিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বরবাদ করা সম্ভব নয়।

এজন্য বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সব ধরনের হিংস্রতাকে একত্রিত করে, সংগঠিতভাবে জিয়া উচ্ছেদে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে সরকার। জিয়াকে ধ্বংস করার পথে আবার সবচেয়ে প্রতিবন্ধক জিয়া পরিবার ও বিএনপি। এ জন্য

www.nagorikpathagar.org

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে হেনস্তা করার জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে হত্যা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মামলার পর মামলা দিয়ে তার চলবার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করা হয়েছে। মতলবি অপপ্রচারের গোয়েবলসীয় কায়দায় জাতির কান ঝালাপালা করে দেয়া হয়েছে। যদিও আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেনি–তারপরও জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে রাগ কমছে না।

দল হিসেবে বিএনপিকে সহ্য করতে হচ্ছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। দলে নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে বিরামহীনভাবে অত্যাচার-নির্যাতন। ক্ষেত্রবিশেষে হত্যা করা হচ্ছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লুট করা হচ্ছে সম্পদ। হামলা, মামলায় জেরবার লোকজন।

তারেক রহমান নাম ভাঙিয়ে কিছু স্তাবক কিংবা বিএনপির মতো রাজনৈতিক সংগঠন–যে সংগঠন গড়ে উঠেছে জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম ও জীবনদর্শনের ওপর ভিত্তি করে, সেই দলের সামান্য কয়েকজন দুর্নীতিবাজ, মূর্খ ও স্বার্থপর নেতার বদনামকে হাজার গুণ বাড়িয়ে চালানো হচ্ছে প্রোপাগান্ডার ঝড়। প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে সেই দলের লোকজন, যে দলের কল্যাণে বাংলাদেশ পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো দুর্নীতিতে বিশ্ব চাম্পিয়ন হয়। যারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে চালু করেছিল গডফাদার তন্ত্র, বাকশালী স্বৈরশাসন, ১০ লক্ষ লোককে মেরেছিল না খাইয়ে।

বিদ্বেষ–নয় : শেখ মুজিব তার সমালোচনা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। ফলে নিজেকে তিনি দাঁড় করিয়ে ফেলেন সংবাদপত্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে। নিবর্তনমূলক কালাকানুন জারি করে হক্-কথা, গণকণ্ঠ, মুখপত্রসহ ডজন ডজন সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে দেন। অর্ধশতাধিক সম্পাদক ও সাংবাদিককে ঢোকানো হয় জেলে। তাতেও কাজ না হলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ৪টি দৈনিক বাদে সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেন। হাজার হাজার সাংবাদিক রাতারাতি পরিণত হয় বেকারে। বাধ্য হয় মানবেতর জীবনযাপনে। অন্যদিকে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা হাতে নিয়েই সংবাদপত্রের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। পল্লবে-পুষ্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় সংবাদপত্র জগতে। সাংবাদিক পেশার উন্নয়নের জন্য প্রথম বারের মতো তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ। জাতীয় প্রেসক্লাবকে একটি আধুনিক প্রেসক্লাবে উন্নীত করার জন্য রাখেন অবদান। নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি। সংবাদপত্রের জন্য প্রতিষ্ঠা

www.nagorikpathagar.org

করেন স্বতন্ত্র আদালত প্রেস কাউন্সিল। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে জিয়ার অবদানের পাশে শেখ মুজিবকে মনে হয় এক হৃদয়হীন ডিক্টেটর। এখানেও জিয়ার ঔজ্জ্বল্য আওয়ামী নেতা-কর্মীদের অসহনীয় লাগে।

তিন

প্রধানমন্ত্রীকে একটা ধন্যবাদ জানাতে চাই। এক সামান্য কবির এই সাধুবাদটুকু গ্রহণ করতে আশা করি তিনি অরাজি হবেন না। গত টার্মে তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, সে সময় তাকে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য ক্রেজি মনে হয়েছিল। এবার এক বছর পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনো ডক্টরেট ডিগ্রি তিনি নেননি। এই না নেওয়ার জন্য আমার মতো অনেকেই খুশি। তবে সংশ্লিষ্ট অনেকের মতে ওইসব ডিগ্রি নেওয়ার জন্য যদি তিনি ব্যস্ত থাকতেন–তাহলে দেশের মানুষ হয়তো একটু বেশি স্বস্তি পেত।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন আজিমপুর স্কুলে 'নাইন'-এর ছাত্রী, সে সময় তিনি একবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে (পৌরনীতি) ফেল করে বসেন। স্বয়ং শেখ মুজিবের কন্যা, বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী ফেল করেছেন, তাও আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে– সে কি হয়! অতএব গৃহশিক্ষক পি কে সাহার অবস্থা সঙিন। তিনি ছুটলেন স্কুলের হেড মাস্টারের কাছে। চেক করা হলো সব খাতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খাতা খুলে দেখা গেল, সেখানে পরীক্ষক লিখে রেখেছেন, 'এই মেয়ে বড় বড় নেতাদের বক্তৃতা অনুসরণ করে, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।' এই কথাগুলো আমি বানিয়ে লিখছি না। অন্য কারও লেখা থেকেও ব্যবহার করছি না। এই উদ্ধৃতি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজের লেখা গ্রন্থ 'বাংলাদেশ : স্বৈরতন্ত্রের জন্ম' থেকে নেওয়া।

এই অসামঞ্জস্যতার কারণেই বোধকরি আমাদের 'বাকমুখর' প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ফুল বেঞ্চ বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়ে রায় দেন, 'আদালত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অধিকতর বোধশক্তি, বিচক্ষণতা, বিবেচনাবোধ ও সতর্কতা আশা করে।' এরপরও তিনি বক্তৃতা-বিবৃতি দ্বারা, সস্তা আবেগ দ্বারা প্রভাবিত এবং অযৌক্তিক। ক্ষেত্রবিশেষে বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। তার ডিগ্রির বহরটাও তেমনই। ৬ লাখ ৫০ হাজার কিলোমিটার আকাশে উড়ে, ৫০টি বিদেশ সফরে ২৪৮ দিন কাটিয়ে যে ১০টি ডিগ্রি তিনি বগলদাবা করেন, তাতে আজকের মহামান্য প্রেসিডেন্ট সে সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান অত্যন্ত আবেগঘন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এত

www.nagorikpathagar.org

অল্প সময়ে শেখ হাসিনা যে পদক ও ডিগ্রি পেয়েছেন এর আগে বিশ্বের আর কোনো রাষ্ট্রপ্রধান এত সম্মান পাননি।... শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য শেখ হাসিনার যে অবদান তাতে তার নাম মাদার তেরেসা, সক্রেটিস, আব্রাহাম লিংকন ও মহাত্মা গান্ধীর পাশে খোদাই করে রাখা উচিত।'

আওয়ামী থিংক ট্যাংকের মূল্যবান 'ডায়মন্ড' লন্ডন প্রবাসী আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী আওয়ামী লীগারদের গদগদ দশা এবং ডক্টরেট নেওয়ার ক্রেজ দেখে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "প্রধানমন্ত্রী যে হারে ডক্টরেট কুড়াতে চেষ্টা করছেন (সম্ভবত স্বামী ড. ওয়াজেদকে একহাত দেখানোর জন্য) তাতে নিজেই একদিন পস্তাবেন। তাকে হয়তো গাইতে হবে; এই মণিহার আমার নাহি সাজে/এ যে পরতে গেলে লাগে/ ছিঁড়তে গেলে বাজে।"

যুক্তরাজ্যের হাল ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিভাগের প্রধান প্রফেসর টেরি ম্যাকলিন তো কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে বললেন, "উন্নত বা অনুন্নত কোনো দেশের সরকারপ্রধান ডিগ্রি কিংবা পুরস্কার জোগাড়ের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান এমন নজির দ্বিতীয়টি নেই।"

দেশের খ্যাতিমান পরমাণুবিজ্ঞানী, আপদমস্তক সজ্জন মানুষ, প্রধানমন্ত্রীর স্বামী মরহুম ড. ওয়াজেদ মিয়ার বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য : "আমলামন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীর আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে গণ্ডগোল লাগিয়ে দিয়েছে। সে বিদেশ থেকে একাধিক 'ডক্টরেট ডিগ্রি' এনে শেখ হাসিনাকে বশীভূত করেছে। কিন্তু এসব ডক্টরেট ডিগ্রি প্রধানমন্ত্রী তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া কোনো কাজে লাগাতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রথম অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি এনেই ম খা আলমগীর আমার সামনে বললেন, যাক গণভবনে এখন দুটি ডক্টরেট হলো। এর মধ্যে প্রকারান্তরে তিনি আমাকে অপমান করেন।"

ডিগ্রি নিয়ে এসব বক্তব্য-বিবৃতির পাশে একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, মরহুম ড. ওয়াজেদ মিয়া তার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলদেশ' গ্রন্থে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আঙুলে তাদের বিয়ের এনগেজমেন্ট আংটি পরানো প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমি হাসিনার হাতে আংটি দেয়ার সময় লক্ষ্য করি, আংটিটি তার আঙুলের মাপের চেয়ে বেশ বড়।" আজিমপুর স্কুল এবং এনগেজমেন্ট আংটি- দুটিই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো সম্পর্ক নেই। দুটি ঘটনা যে খুব বড় কোনো কিছু তাও নয়। কিন্তু আজকের বাস্তবতার আলোকে বিচার করলে কিছু চমকে ওঠার মতো বিষয় বৈকি।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রিক জীবনে তিনি যেমন বাস্তবতার বাইরে থাকতে চাচ্ছেন, তেমনি ব্যক্তিজীবনেও ছিলেন। সেখানে তার এনগেজমেন্ট আংটি আঙুলের মাপের চেয়ে বড় হয়ে যায়। এজন্যই আজিমপুর স্কুলের সেই শিক্ষকের দূরদর্শিতা এবং বিশ্লেষণ করার নির্ভুল ক্ষমতাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

আমরা যতই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি, এই দুটি ইঙ্গিতময় ঘটনার মধ্য দিয়ে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছেন শেখ হাসিনা। পরীক্ষার গুরুত্ব তিনি সেদিন যেমন অনুধাবন করতে পারেননি, বুঝতে পারেননি; পরীক্ষাটা রাজনীতির মেঠো বক্তৃতা নয়, এর একটা আলাদা ব্যাকরণ, আলাদা পদ্ধতি আছে, আছে আলাদা উপস্থাপন ভঙ্গি– তেমনি বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েও তিনি একই কাণ্ড করেছেন।

যে রাজনীতি বা যে কৌশলেই তার মাথায় জয়ের মুকুট উঠুক, যতই দিন যাচ্ছে আমরা অনুভব করতে পারছি, বাংলাদেশের মুকুটের চাইতে তার মাথার সাইজ কিছুটা ছোট বা তার মাথার চাইতে বাংলাদেশের মুকুটের আকার কিছুটা বড়। এখানেও অসামঞ্জস্য।

এ কারণেই যখন বাইরের দেশে কেউ তাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়ে 'মুখ্যমন্ত্রী' বলে সম্বোধন করে, তখন সেই উচ্চারণ এদেশের মানুষের গালে চপেটাঘাতের মতো লাগলেও, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তা নিতান্তই কৌতুকের মতো ব্যাপার। অর্থাৎ, বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে তিনি ব্যর্থ।

তার ১৯৯৬ পর্বের যাত্রাও শুরু হয়েছিল অসংগতি দিয়ে। ২৩ জুন ১৯৯৬ বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত বেদনা-বিধুর একটি দিন। ১৭৫৭ সালের এই দিনে পলাশির মাঠে দেশি-বিদেশি বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে দেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। সেই থেকে দিনটি শোক-দুঃখ-পরাজয় ও বেদনার দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দেশপ্রেমিক মানুষ এইদিন সভা-সেমিনারে মাধ্যমে পলাশি ট্র্যাজেডি স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে।

আর বিশ্বাসঘাতকতা দেশদ্রোহীদের কাছে দিনটি বিজয়ের দিন, আনন্দ-উল্লাসের দিন। কোলকাতার বাবু-বুদ্ধিজীবীদের পূর্বপুরুষরা দিনটিকে বিজয় উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপনও করত। আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর হয়তো সবদিকে চোখ রাখার অবকাশ ছিল না ব্যস্ততার কারণে। কিন্তু পারিষদরা তো ছিলেন, তাদের মাথায়ও এটা এলো না। এলো না বলেই ইতিহাসের নিয়তি তাদের ঠেলে নিয়ে গেল মীরজাফরের উত্থান পর্বের কাছাকাছি।

www.nagorikpathagar.org

হাতের তসবি কিংবা মাথায় হিজাব পরে সাময়িক বিভ্রান্ত হয়তো কাউকে কাউকে করা গেছে, যেমন দিন বদলের কথা বলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের কাজল বুড়িগঙ্গার পচা পানির চাইতেও মলিন হয়ে গেছে। আসলে ওসব কথা শুধুই কথামালা, কোনো বেশ নয় ছদ্মবেশ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এজন্যই নানা অসংগতির পাকে তিনি বারবার জড়িয়ে পড়েন। হয়তো তার ইচ্ছায় অথবা তার অজ্ঞাতে সরকারের একের পর এক কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মের মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিস্ময়, বিদ্বেষ, সংশয় আর সন্দেহ। এরই সর্বশেষ উদাহরণ জিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম।

আমি জানি না, আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনো 'দুষ্টচক্র' সব শুভবুদ্ধি ও কল্যাণের দুয়ার বন্ধ করে দেশকে এক শ্বাসরুদ্ধকর দোজখে ফেলে দেওয়ার জন্য কাজ করছে কি না। 'দুষ্টচক্রই' বলব। নির্বাচনী অঙ্গীকার, দেশের উন্নয়ন, জনকল্যাণের কাজ বাদ দিয়ে নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে যারা দেশের স্থিতিশীলতা বিনাশের পাঁয়তারা করছে তাদের শনাক্ত করা কি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব? তিনি অবাস্তব, অযৌক্তিক, অসংলগ্নতার সাথেই মিশে থাকবেন, নাকি বিভেদ, ঘৃণা ও হানাহানির বিভক্তি রেখা উৎপাটন করতে পারবেন? তাও আমাদের জানা নেই। এও বলি, প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা যদি থাকেও আর গৃহপালিত ভ্যাম্পায়ার বুদ্ধিজীবী ও স্তাবক অনুচরেরা কি সেই মঙ্গলের দিকে তাকে যেতে দেবে? তারা কি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ফেল করা ছাত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনায় পাশ করতে দেবে?

ঘটনা যাই ঘটুক তারপরও সবশেষে বলব শহিদ জিয়ার প্রতি যে ভাষা ও আচরণ প্রদর্শিত হচ্ছে তা সংগত নয়। এসব তার প্রাপ্যও নয়। এই অন্যায্য ও অন্যায়ের বাইরে না দাঁড়ালে খুব খারাপ দৃষ্টান্ত নির্মাণ হবে। কারণ জাতীয় কবির ভাষায় : 'যুগের ধর্ম এই/পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই'। কারণ সবাই জানি– 'প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।'

তাছাড়া আজ যেসব আগাছা-পরগাছা প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়ে বন্দুক রেখে জিয়া উচ্ছেদের মচ্ছবে মেতে আছেন, তারা না জানলেও শেখ হাসিনা জানেন জিয়াউর রহমান কিংবা পরিবারের লোকজন কোনো দিন মুজিব কিংবা মুজিব পরিবার সম্পর্কে কখনোই কোনো অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি বা কর্ম করেননি। এবং এই না করাটাই তো সংগত। সেই সংগতির দিকে চোখ রেখে আবারও জাতীয় কবির ভাষায় আসুন উচ্চারণ করি :

www.nagorikpathagar.org

'আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম মহান,
চলমান বেগে প্রাণ উছল।
রে নবযুগের স্রষ্টা দল,
জোর কদম চলরে চল ॥'

সূত্র : দৈনিক আমার দেশ : ১৫ মার্চ ২০১০

www.nagorikpathagar.org

একজন হাবিলদার অন্যজন মেজর

তাঁদের একজন হাবিলদার অন্যজন মেজর। দুজনেই ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্য এবং তারুণ্যে দীপ্ত। কর্মমুখর সৃষ্টিমুখর এক অবিস্মরণীয় জীবন তাঁরা উদ্‌যাপন করে গেছেন। আর জাতির জন্য একই সঙ্গে হয়ে উঠেছেন রাহবার, স্থপতি, নির্মাতা, সহযোদ্ধা, সেনাপতি। আত্মার আত্মীয়। নিঃশ্বাস ও বিশ্বাসের অঙ্গাঙ্গী। আত্মার সঙ্গে শরীরের মতো অবিচ্ছেদ্য। জাতিসত্তা, জাতীয় ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য সবকিছু আলাদা আলাদাভাবে আবার একীভূত অবয়বের রূপকার। এঁদের একজনের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে, অন্যজনের জন্ম আরো ৩৭ বছর ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। একজন জন্ম নিয়েছিলেন বর্ধমানে। অন্যজন বগুড়ায়। একজনের গ্রামের নাম চুরুলিয়া, অন্যজনের বাগবাড়ী। অজয় নদীর ধারা যেন নেমে এলো যমুনায়। হাজি পালোয়ানের মাজার প্রাঙ্গণ থেকে যে জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ল, তা যেন আবার মানবিক হয়ে উঠল শাহ সুলতান শাহী সওয়ারের দেশে। একজনের দুঃখিনী জননী জাহেদা খাতুন, অন্যজনের জন্মদাত্রী জাহানারা বেগম।

তাঁরা এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। যেন তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিল মানুষ, অনাদিকালের মানুষ। হ্যাঁ, আমি আমাদের জাতীয় কবি, জাতীয় জাগরণের কবি, মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং আমাদের স্বাধীনতার মহান ঘোষক, মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ, স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্থপতি শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কথা বলছি। একজন আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির চেহারা পাল্টে দিলেন, অন্যজন উপহার দিলেন নতুন মানচিত্র। 'সত্যিকার অর্থেই তাদের গৌরবময় উত্থান হাবিলদার এবং মেজর হিসেবে।

ক্রান্তিকালের নায়ক

এই দুই মহাপুরুষের উত্থান শাব্দিক এবং তাত্ত্বিক উভয় অর্থেই ক্রান্তিকালে। ১৭৫৭ সালে পলাশি বিপর্যয়ের পর এ দেশবাসী বিশেষ করে মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

ওপরে নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তাদের উৎখাত করেই সাম্রাজ্যবাদ কর্তব্য শেষ করেনি। সামাজিকভাবে তাদের শেষ করার জন্য কেড়ে নেওয়া হলো সম্পদ। উৎখাত করা হলো সর্বস্তর থেকে। বন্ধ করে দেওয়া হলো স্কুল-কলেজে প্রবেশ করার অধিকার। মুসলমানরা সংগত কারণেই বেছে নিল মোকাবিলার পথ। এক্ষেত্রে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল দুটি শক্তি। এক. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দুই. সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা কলিকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বেনিয়া, মুৎসুদ্দি, মহাজন, জমিদার এবং ফোর্ট উইলিয়ামীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সাম্প্রদয়িক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

এই দুই শক্তির গ্যাঁড়াকলে আটকে গেল এ দেশের রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। বড় বড় মহাপুরুষীয় বাণী কপচানোর আড়ালে বেড়ে উঠতে থাকল নিকৃষ্ট শ্রেণির দালাল। এই দালাল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির পাল্লায় পড়ে অবশ হয়ে গেল সাহিত্য, রাজনীতি। ঔজ্জ্বল্যহীন, পুরুষত্বহীন, ব্যক্তিত্বহীন দালালির সেই দিনগুলোতে ভাষাহীন, আশাহীন, সংবিৎহীন, অচল, অবশ, উদ্ধারহীন গা ঘিনঘিনে অন্ধকারে, বটতলা থেকে স্বজাতিকে উদ্ধার করে পরিষ্কার দিনের আলোয় নিয়ে এলেন যিনি, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। দেশ ও মানুষবিমুখ সাহিত্যকে ধুয়া ও কুয়াশার বাইরে এনে খটখটে মাটির ওপর দাঁড় করালেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন, দায়িত্ববোধহীন অভিজাত দালালদের যক্ষপুরী থেকে উদ্ধার করে তাকে বানালেন রক্তমাংসের মানুষ। তিনি নির্মাণ করলেন আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বর্তমান পাটাতনটি।

একজন হাবিলদার এতসব অভিজাত রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, নাইট, জমিদার শ্রেণির ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে ছিনিয়ে নিলেন মানবতার মুকুট। সংগত কারণেই এলিট শ্রেণির চোখ সরু হয়ে গেল। কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামির মুখোশ বুঝি মুখে থাকে না। তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৃষ্ণার্ত মানুষ ও মৃত্তিকা সবার উর্ধ্বে তুলে ধরল মানুষের কবিকে। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে বাবুদের বাগানবাড়ির ঝাড়বাতি আছড়ে পড়ল মেঝেতে। এই তেজ ও ঔদ্ধত্য তার অফুরন্ত যৌবনের, বাবুদের কায়েমি স্বার্থের গাম্ভীর্য বারবার পদদলিত করল। একজন সামান্য হাবিলদারের হাতে মার খেয়ে সেদিন বাবু-বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছিলেন। একজন সামান্য হাবিলদারের (!) এই উচ্চারণ–

বল বীর
বল চির উন্নত মম শির

www.nagorikpathagar.org

–সেদিন বাবু-বুদ্ধিজীবীরা মেনে নিতে পারেননি। তাদের মানা না মানায় অবশ্য এ দেশের মানুষের কিছু যায় আসেনি। এখনো আমাদের দেশে এই কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু-বুদ্ধিজীবীদের কিছু উচ্ছিষ্টভোগী, মতলববাজ স্বার্থান্ধ অনুসারী আছে, আজও অন্ধের মতো বাবুদের চামচে হরদম চিনি খাচ্ছেন। কারণ জমিদার মহাজনদের নিয়ে কাজ করার মধ্যে লেজ নাড়ানোর একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু নজরুলীয় কাজে লেজ নাড়ানোর কোনো উপায় যে নেই!

আরেকজন শহিদ জিয়াউর রহমান। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর পাকিস্তান হলো। কিন্তু শোষণ-বঞ্চনার কলকবজা রইল অটুট। মানুষ বঞ্চিত হতে হতে একদিন স্বাধীনতার জন্য দাঁড়াল। ২৫ মার্চের রাতে ঘুমন্ত নগরীর ওপর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদাররা, তখন মুক্তিযুদ্ধের সোল এজেন্সির দাবিদার আওয়ামী নেতারা কোথায়? শেখ মুজিব গ্রেফতার বরণ করলেন পাকিস্তানিদের কাছে। অন্যরা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' জান নিয়ে পালালেন ভারতে।

সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় সময়ে দিশেহারা, হতাশ, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ জাতির সামনে অনেকটা অলৌকিকভাবে হাজির হলেন একজন সামান্য মেজর। জিয়াউর রহমান। বললেন, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমরা সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এটা যেন কোনো ঘোষণা ছিল না। যেন ছিল একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ। মুহূর্তের মধ্যে এই ঘোষণা স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল দেশময়। আবেগে-আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল দেশ। মানুষ নির্দেশনা পেয়ে গেল। নেতা পেয়ে গেল। শুরু হলো মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীন হলো দেশ। স্বাধীনতার ঘোষক ফিরে গেলেন তার কর্মস্থলে।

১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর দেশে যখন একটা স্থিতিশীলতার হাওয়া সবে বইতে শুরু করেছে; সেই সময় ৩ নভেম্বর আধিপত্যবাদের এ দেশীয় নিয়োগীরা অভ্যুত্থান ঘটাল। আবার হতাশা। আবার জাতির চেতনাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা। ৭ নভেম্বর গর্জে উঠল দেশপ্রেমিক সিপাহি-জনতা। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে এলো পথে। অপশক্তির শেষ চিহ্নটুকু অপসারিত হলো। আবার ঐতিহাসিকভাবে জাতিকে, দেশকে রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলো স্বাধীনতার ঘোষকের ওপর। শক্ত হাতে হাল ধরলেন জিয়া।

তলাবিহীন ঝুড়িকে তিনি স্বনির্ভর বাংলাদেশে পরিণত করলেন। ভিক্ষুকের হাত পরিণত হলো কর্মীর হাতে। আত্মপরিচয় বিনষ্ট করার যে

www.nagorikpathagar.org

চক্রান্ত চলছিল, জিয়া তার মোকাবিলায় গ্রহণ করলেন দৃঢ় অবস্থান। বাক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলো। বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরে এলো। তিনি উপহার দিলেন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। এই দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর রক্ষাকবচ। স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা হলো উচ্চকিত। বিপথগামী বাঁদরের ভেঙচি এখানে-ওখানে থাকল বটে, কিন্তু জাতি জেনে গেল, কী তার পরিচয়, কোন পথ তার বাঁচার পথ।

এখানেও মার খেল অভিজাতরা। কায়েমি স্বার্থের তল্পিবাহকরা। দেশদ্রোহী দালালরা। এলিটদের মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা। কোথাকার কোন অখ্যাত মেজর সে কি না একটা স্বাধীন বাংলাদেশের পথে যেতে বাধ্য করল রাজনীতির নিয়ন্ত্রকদের। আপসকামীদের বাধ্য করল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে। বাড়া ভাতে ছাই পড়ার অবস্থা। কৃতিত্ব দিতে হবে একজন মেজরকে। এটা কৃতিত্বের একক দাবিদার এবং তাদের গৃহপালিত বুদ্ধিজীবী ও দালালদের গাত্রদাহের অন্যতম কারণ আজ। এ কারণেই নানা প্রজাতির ঘোষক আমদানিতে তারা অষ্টপ্রহর নির্ঘুম। যেমন নজরুলকে ছোট করার জন্য আমাদের একশ্রেণির দালাল গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের চেষ্টার অন্ত নেই।

তিন্তিড়ি গাছে জোনাকি দল

তিন্তিড়ি গাছে ঝোঁপের মধ্যে জোনাকিরা জটলা পাকায়, আর চাঁদের আলোর নিন্দা করে। আমাদের দূষিত রাজনীতি ও সংস্কৃতিসেবীদের ধরেছে সেই রোগে। কিন্তু কে না জানে এতে চাঁদের কোনো যায় আসে না। মাঝখান থেকে জোনাকি দলেরই জান চলে যায়।

নজরুল ইসলাম এবং শহিদ জিয়ার বিরুদ্ধে আজ যারা বিষোদগার করে তারা যে এই দুই মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের খবর জানে না–তা নয়। কিন্তু তাদের উপায় নেই। কারণ তারা তো সেসব লোক, যারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মোহে শয়তানের কাছে বিক্রি করেছে আত্মা। ফলে এখন আধিপত্যবাদী শয়তান যেভাবে তাদের চলতে বলে, লিখতে বলে, সেভাবেই তারা চলে বা বলে। কিন্তু কে না জানে ইতিহাসের অনিবার্য রায় এই দুজনের পক্ষে। ইতিহাস তাদের নির্মাণ করেছে। তাঁরা নিজেরা নির্মাণ করেছেন ইতিহাস। বাকি সব পথের দুপাশের বাসিন্দা।

বাংলাদেশের মানুষ জানে, যে ভূখণ্ডটি তার পায়ের নিচে, একে যদি রক্ষা করতে হয়, একে যদি একটি মর্যাদাময় আসনে বসাতে হয়, তাহলে ইতিহাসের এই দুই নায়কের কাছে জানু পেতে বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

www.nagorikpathagar.org

অন্য কোনো পথ ও পদ্ধতি, তা যতই সুন্দর ও উপভোগ্য হোক-সে পথ বাংলাদেশের নয়।

সেজন্যই শত শত চক্রান্ত, জটিল-কুটিল ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ তার চেতনায়, তার প্রাণের নিবিড়তম স্থানে অবলম্বন করে রেখেছে সেই হাবিলদার কবিকে আর মেজর জিয়াকে।

কে কী মনে করল, কে কী ভাবল তাতে বাংলাদেশের মানুষের কিছু যায় আসে না।

সূত্র : আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত জাতীয় কবি ও শহীদ জিয়া। নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

সচিত্র স্বদেশের শহিদ জিয়া : প্রথম অ্যালবাম

এক

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন বন্ধ করে দেন দেশের সকল সংবাদপত্র। সরকার ও ব্যক্তি শেখ মুজিবের মহিমা ও কীর্তি বর্ণনার জন্য বাঁচিয়ে রাখা হয় মাত্র চারটি দৈনিক। একই বছর ২৫ জানুয়ারি তিনি নিষিদ্ধ করেন সকল রাজনৈতিক দল। গঠন করেন বাকশাল নামের এক কিম্ভূতকিমাকার রাজনৈতিক যাত্রাপার্টি। এক নেতা এক দল—এই দর্শনের মাধ্যমে অচল অবশ করে দেওয়া হলো বাক্, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সকল গণতান্ত্রিক চেতনা। একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতি যখন স্বপ্নের জাল বুনছে গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজ ও স্বনির্ভর মর্যাদাবান বাংলাদেশের, সেই সময় সূচনালগ্ন থেকেই ডানা বিস্তার করে স্বৈরশাসন। শুরু হয় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ব্যাপক লুণ্ঠন, জিঘাংসা, দমন পীড়ন ও হত্যার তাণ্ডব। '৭৫-এ এসে তা রূপ নেয় দুঃশাসনে। যে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনকে সম্বল করে যাত্রা শুরু করেছিলেন শেখ মুজিব, মাত্র তিন বছরে তা বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। জনগণ পরিত্রাণের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু 'রক্ত করবী'র আত্মবিমোহিত রাজার মতো শেখ মুজিব তা অনুধাবন করতেও ব্যর্থ হন। ফলে দুর্ভাগ্যজনক হলেও ঘটে যায় ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। অবসান ঘটে মুজিবী শাসনকালের।

৩ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটায় শেখ মুজিবের নামে সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ। আবার আগ্রাসনের আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে দেশ। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য পথে নেমে আসে দেশপ্রেমিক সিপাহি জনতা। জন্ম নেয় ৭ নভেম্বর বিপ্লব। খুলে যায় সকল রুদ্ধ কপাট। ফিরে আসে মূল্যবোধ, বাক্, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বহু কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র। সত্যিকারের অগ্রগতির দিকে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশের। এবার রাষ্ট্রের হাল দেশনায়ক জিয়াউর রহমানের হাতে।

এই সিপাহিজনতা বিপ্লবের ধারাবাহিকতারই ফসল সাপ্তাহিক সচিত্র স্বদেশ।

www.nagorikpathagar.org

দুই

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ৪৫ তম জন্মদিনের ২ মাস পর, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁর স্বাধীনতার সেই অসম সাহসী ঘোষণার ১০ বছর পর, একই চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে তাঁর বেদনার্ত শাহাদাত বরণের মাত্র ৭২ দিন আগে, ১৯৮১ সালের ১৯ মার্চ, ৫ চৈত্র ১৩৮১, ১৯ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সচিত্র স্বদেশ। সকল যোগাযোগের ঠিকানা ছিল ২৯/১ পুরানা পল্টন। ঢাকা-২। ফোন : ২৫৭১৭৫।

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা'য় আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলা হয় :

'সচিত্র স্বদেশ প্রকাশিত হল। বাজারে এ ধরনের আরো ম্যাগাজিন রয়েছে। তবু কেন আমরা আর একটি সাপ্তাহিক প্রকাশের ঝুঁকি গ্রহণ করলাম, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। ঠিক কৈফিয়ৎ নয়; আবার জওয়াবও নয়; অনেকটা স্বগতভাবেই বলতে চাই, চিরাচরিতের মাঝখানে ব্যতিক্রমধর্মী একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করেছি বলেই সচিত্র স্বদেশের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

ইদানীং দেশের সব কিছুতেই নানান মতের ও পথের ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক সমাজে মত ও পথের পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু অধুনা যে কোন মতভেদ সামান্যতেই মতবিরোধের পর্যায়ে পৌঁছার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ ধরনের অবস্থা সমাজে শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না; চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সেই আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সমাজ তথা দেশ ও জাতিকে সুস্থ, সুন্দর ও গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা অনুভব করেন, সমাজে তাঁদের সংখ্যা বেশি বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, আজ সময় এসেছে এসব মানুষের অভিমত ব্যক্ত করার; এবং প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ ধরনের বলিষ্ঠ তৃতীয় মত প্রকাশের জন্য নিরপেক্ষ একটি ফোরামের। সচিত্র স্বদেশ সেই বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ তৃতীয় মত প্রকাশেরই ফোরাম হতে চায়। আমরা যে ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্যের দাবি করছি, তার মূল সুর এটাই। সচিত্র স্বদেশ বস্তুত স্বদেশের মাটি ও মানুষ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকেই রস আহরণ করবে। বিদেশের দ্বার তাই বলে রুদ্ধ থাকবে না; কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে থাকবে স্বদেশ ও স্বজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হাসি-কান্নার অবিমিশ্র প্রকাশ। সকল রকম সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে প্রকাশ করার প্রয়াস পাব।'

www.nagorikpathagar.org

জন্মলগ্নের এই ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে পথচলা শুরু হয় স্বদেশের। না, স্বদেশ কোনো দলের মুখপত্র ছিল না। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল তৃতীয় মত প্রকাশের ফোরাম হয়ে ওঠার। 'সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও গোড়ামির' উর্ধ্বে পত্রিকাটি ছিল সত্য, তবে অচিরেই তৃতীয় মত প্রকাশের ফোরাম হয়ে ওঠার স্বপ্ন তাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। এ জলাঞ্জলির কারণ অন্তর্নিহিত কোনো ব্যর্থতা নয়, 'সব কিছুর উর্ধ্বে থাকবে স্বদেশ ও স্বজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হাসি-কান্নার অবিমিশ্র প্রকাশ'-এর প্রতি তার কুণ্ঠাহীন প্রীতি। আসলে দেশপ্রেম দায়িত্বশীলতা সচিত্র স্বদেশকে তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' হওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক চাতুর্য থেকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে আসে জনগণের আত্মিক চেতনার কাছাকাছি, জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের প্রধান স্রোতে। সে হয়ে ওঠে জন-গণ-মন কণ্ঠস্বর। একটা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের জন্য এ এক বিরাট অর্জন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না এই কৃতিত্বের দাবিদার সচিত্র স্বদেশের সম্পাদক জাকিউদ্দিন আহমদ এবং ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন।

সচিত্র স্বদেশের মাত্র ১১টি সংখ্যা বেরিয়েছে, এর মধ্যে ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশের বক্ষবিদীর্ণ করে, সমগ্র জাতিকে স্তম্ভিত করে ঘটে যায় বেদনার্ত এবং কলঙ্কিত ঘটনা। সেনাবাহিনীর কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্ষমতান্ধ বিভ্রান্ত কয়েকজনের হিংস্র বুলেটে নির্মমভাবে নিহত হলেন স্বাধীনতার মহান ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিপাহি-জনতা বিপ্লবের প্রাণ পুরুষ, স্বনির্ভর বাংলাদেশের নির্মাতা, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের স্থপতি, আধুনিক বাংলাদেশের প্রতীক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। আর টালমাটাল করে কেঁপে উঠল আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি।

জিয়াউর রহমান যদি অন্য অনেক রাষ্ট্রনায়কের মতো কেবলই একজন প্রেসিডেন্ট হতেন তাহলে হয়তো তেমন কিছু বলার থাকত না। কিন্তু তিনি নিছক একজন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের অনেকগুলো অবিস্মরণীয় ঘটনার নায়ক। সেই দুঃসহ দিনে যখন সবাই নিজ নিজ পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে পলায়নপর, সেই সময় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি জাতিকে দিয়েছিলেন সঠিক দিশা এবং নির্দেশনা। সেদিন তিনি জাতির সামনে উদ্ভাবিত হন 'বাতিঘর' হিসেবে। সেখানেও তিনি শেষ করতে পারতেন কর্তব্য। তাহলেও তাঁর ভাবমূর্তির কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু সুবিধাবাদের পথ তাঁর নয়। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন মরণপণ

www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হলো। কোন পুরস্কারের তোয়াক্কা না করে ফিরে গেলেন ব্যারাকে।

এর মধ্যে দেশের আকাশে ঘনিয়ে ওঠে দুর্যোগের মেঘ। সম্ভাবনার সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। দেশ বাঁচানোর জন্য সংঘটিত হয় ৭ নভেম্বর অবিস্মরণীয় সিপাহি-জনতা বিপ্লব। আবার জাতিকে সর্বনাশের কিনার থেকে উদ্ধার করে আনেন জিয়াউর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে দেখা দেয় রাষ্ট্রগত পরিচয় তথা আত্মপরিচয়ের সংকট। এই সংকট ঘনিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীগুলোকে ক্ষুব্ধ করা হচ্ছিল, অন্যদিকে মহাভারতে প্রয়াণলাভের জন্য একটি কবর হচ্ছিল খোদিত। এই যাতনায় শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা একটি পরিত্রাণ লাভের জন্য করছিল ছটফট। শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট জিয়ার দৃষ্টি পড়ে এদিকে। দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও দেশপ্রেম দিয়ে বিভেদ, বিভাজন ও হানাহানি মুক্ত, সমঝোতা, সম্প্রীতিময় পাটাতন নির্মাণের দিকে নিঃশঙ্ক চিত্তে গেলেন এগিয়ে। যেখানে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোরও থাকবে পূর্ণ স্বীকৃতি এবং সমান মর্যাদা। এই রাষ্ট্রদর্শন 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'। যা আজ বাংলাদেশের টিকে থাকার মূল চেতনা হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

এরপর তিনি ভিক্ষুকের হাতগুলোকে কর্মীর হাতে পরিণত করলেন। তৃতীয় বিশ্বের একটি 'তলাবিহীন ঝুড়িকে' মেরামত করে, করে তুললেন স্বনির্ভর। গণমানুষের কাছে আবার ফিরিয়ে আনলেন গণতন্ত্র। জামাধরা, ধামাধরা পুরাতন বস্তা পচা রাজনীতির খোল নলচে পালটে চালু করলেন উন্নয়নের রাজনীতি। কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সবক্ষেত্রে দেখা দিল জাগরণ। এ হলো সেই জাগরণ, যার জন্য একটি জাতি করেছে অনেক ত্যাগ। করছিল অপেক্ষা। ফলে দেশের মধ্যে যেমন জনমনে ফিরে এল আত্মবিশ্বাস, স্বপ্ন, সম্ভাবনা, তেমনি বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দেশের ভাবমূর্তি। এতগুলো কাজ এক জীবনে অনেক দেশনেতারই করা হয়ে ওঠে না।

একটা পল্লবঘন প্রশান্তি আবহাওয়া যখন চারদিকে, সেই সময়ে চট্টগ্রামে গর্জে উঠল ঘাতকের বুলেট। আর রক্তাক্ত বক্ষে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বাংলাদেশের সমৃদ্ধ বর্তমান, স্বপ্নের ভবিষ্যৎ।

বেদনায় মুহ্যমান জাতি অতি দ্রুত অনুধাবন করল, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অগ্রগতির চাকাকে থামিয়ে দেয়া,

www.nagorikpathagar.org

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব তথা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিনাশ করা। সংগত কারণেই এই সর্বনাশ রুখতে অভূতপূর্ব সংহতির মধ্যে জাতি নেমে এলো রাস্তায়। একটি লাশের পাশে সেদিন সারা দেশ। ১১ কোটি মানুষের তখন একটাই নাম জিয়াউর রহমান।

তিন

শহীদ জিয়ার শাহাদতের মধ্য দিয়ে নতুন করে অনুভূত হলো কেন একটি সচিত্র স্বদেশ দেশে দরকার। নতুন করে প্রতিভাত হলো স্বদেশের সামাজিক গুরুত্ব। কারণ জাতির সর্বপ্লাবী বেদনাকে ধারণ করার জন্য সেদিন সচিত্র স্বদেশ যে ভূমিকা পালন করেছে আজও তার কোনো তুলনা হয় না। যে অপরিসীম আবেগ ও মমতা দিয়ে জনশোককে বক্ষে ধারণ করেছে এই সদ্যজাত সাপ্তাহিক কাগজটি তেমন আর কেউ করেনি। একই সঙ্গে শহিদ জিয়ার জীবন ও অবদান নিয়ে সম্পূর্ণ নির্মোহ চোখে প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম উপহার দেওয়ার একক কৃতিত্বও এই কাগজটির।

১৮ জুন, ১৯৮১, প্রথম বর্ষ ১৪শ সংখ্যায় রাজনীতির কলামে 'জিয়ার মৃত্যু, তালপট্টি এবং কিছু জিজ্ঞাসা' শীর্ষক যে নিজস্ব নিবন্ধটি স্বদেশ ছাপে, তা আজও নতুন করে মূল্যায়নের দাবি রাখে :

"একই সঙ্গে কাক উড়ে যাওয়া আর তাল পড়ার ঘটনা নিয়েই বাংলা অভিধানে 'কাকতালীয়' শব্দটা চালু আছে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিহত হওয়া আর তালপট্টি ইস্যুটির হিমাগারে গমন তেমনি কোন কাকতালীয় ঘটনা কিনা দেশব্যাপী সেই জিজ্ঞাসাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জিয়ার মৃত্যুর সম্পর্কেও একাধিক প্রশ্ন একাধিক মহল একাধিকভাবে তুলেছেন। জিয়ার প্রকৃত হত্যাকারী কে, তা নিয়েও দেশব্যাপী জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। কোন কোন মহল মনে করছে, যে মুহূর্তে গোটা জাতি তালপট্টি প্রশ্নে একাত্মা হয়ে উঠেছিল, এমনকি ভারতপন্থী বলে কথিত দলগুলোও জনমতের চাপে পড়েই তালপট্টি প্রশ্নে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছিল, সে মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ড কম রহস্যজনক নয়।

শেষদিকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে, তিনি ভারত তোষণ নীতি অবলম্বন করেছেন। এমন কি দেশের স্বার্থ পর্যন্ত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের নিকট বন্ধক দেওয়া হয়েছে বলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এবং সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, এ অভিযোগ তুলেছে ভারতপন্থী বলে কথিত মহলগুলোই। জিয়া চুপ করে শুনে গেছেন, প্রথম দিকে তেমন কোন উচ্চবাচ্য করেননি। তারপর শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন

www.nagorikpathagar.org

এবং প্রায় একই সঙ্গে তালপট্টি দ্বীপে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবতরণ ও অবস্থান গ্রহণ; এবং দু'দুটি ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজের বাংলাদেশ সমুদ্র সীমানায় টহল দান–দেশব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। পার্লামেন্টে এ নিয়ে কথা উঠেছে। সরকার ও বিরোধী দল শেষ পর্যন্ত তালপট্টিকে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তালপট্টির উপরে যেকোন আগ্রাসনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপরে হামলা হিসেবে একবাক্যে আখ্যায়িত করেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়া অবশেষে ঘোষণা করেছেন, তালপট্টি উদ্ধারে বাংলাদেশ সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে। মৃত্যুর আগে চট্টগ্রামে বুদ্ধিজীবী সমাবেশেও প্রেসিডেন্ট জিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, তালপট্টি আমাদের হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্!

কিন্তু তালপট্টি প্রশ্নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগেই প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ইহধাম ত্যাগ করতে হল। গোটা দেশ গোটা জাতির স্বতঃস্ফূর্ত আর অশ্রু ভরা ভালবাসা, আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার এই হত্যাকাণ্ডে। কেন প্রেসিডেন্ট জিয়াকে অকালে ঘাতকের নির্মম বুলেটের শিকার হতে হল? সে শুধু মুষ্টিমেয় এডভ্যাঞ্চারিস্ট-এর ক্ষমতা লিপ্সায়? নাকি তালপট্টি ইস্যুকে একটি সুস্পষ্ট স্ট্যান্ড গ্রহণ করার কারণে পর্যবেক্ষক মহলের বক্তব্য এই পর্যায়ে প্রণিধানযোগ্য! জিয়ার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গোটা দেশে একটামাত্র আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, তালপট্টির প্রশ্নে আপোষ নেই। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এক আওয়াজ, এক শপথ। তারপর এল ঘাতকের সেই কালরাত্রি। আবুল মঞ্জুরের তথাকথিত চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান, ক্যাপটেন অনন্ত-এর সেই চট্টগ্রাম বেতার দখল এবং মাঝখানে গোটা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ড।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করলে কি দেখা যায়? জিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল, নাকি হত্যা করা হয়েছিল তালপট্টি ইস্যুটিকে? তালপট্টি বলে কোন ইস্যু যে গোটা দেশকে সমভাবে আন্দোলিত করেছিল, তালপট্টি নামের বাংলাদেশী দ্বীপটিতে যে ভারতীয় বাহিনী অবতরণ করে অবস্থান গ্রহণ করে রয়েছে, আজ সে বক্তব্য কোথাও উচ্চারিত হচ্ছে কি?

ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ দু'টি কি হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনা ত্যাগ করে চলে গেছে? পত্রিকান্তরে প্রকাশিত–সেই বালুর বস্তার বাংকারে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সমরনায়ক চোখে বায়নোকুলার লাগিয়ে শ্যেণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের দিকে, সেই শ্যেণদৃষ্টি কি মুহূর্তের জন্যও সরিয়ে নেয়া হয়েছে? হয়নি। বরং ভাবাবেগে আপ্লুত বাংলাদেশের জনগণের সাথে

www.nagorikpathagar.org

ভারতীয় নেতা উপনেতারা, বেতার ও প্রচারবিশারদরা সমস্বয়ে 'হায় জিয়া' 'হায় বাংলাদেশ' বলে মাতম তুলেছেন। কোথায় গেল তালপট্টি উদ্ধারের প্রশ্ন? কোথায় পড়ে রইল সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা? আমরা খবর পেয়েছি, জিয়ার হত্যাকাণ্ডে তালপট্টি জবর দখলকারী ভারতীয় জওয়ানরা ধূমধামের সাথে উৎসব পালন করেছে। একি কবিগুরু কথিত সেই 'লীলার ছল', যা একটু ঘুরিয়ে প্রকাশ করা চলে এই ভাবে যে, "ভিতরে যবে হাসির ছটা বাহিরে তখন আঁখির জল?"

জিয়ার মৃত্যুতে বস্তুত সত্যিকারার্থে লাভবান হয় কারা? তালপট্টি ইস্যুটি কার্যত হিমাগারে প্রেরিত হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে কারা? তালপট্টি ইস্যুতে দেশ ও জাতি একত্রিত হওয়ায় কারা বিব্রত বোধ করেছিল? আজও কারা শুধুমাত্র ভাবাবেগ আর অশ্রুকেই দেশ ও জাতির আর কোন প্রশ্ন আর কোন সমস্যার চাইতে বড় করে তুলে ধরে ফায়দা হাসিল করতে চাইছে? জিয়ার সব প্রকাশ্য ও গোপন গুণাবলি প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু ভুলেও কেন উচ্চারিত হচ্ছে না তার সেই অমোঘ ঘোষণা : তালপট্টি আমাদের হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

জিয়ার মৃত্যুতে বি.এন.পি যেসব প্রস্তাব নিয়েছে সেসব প্রস্তাবে তালপট্টি ইস্যুটি এসেছে বলতে গেলে শেষের দিকে এবং অনেক দায়সারা গোছের ভাবে। সুদূর বাগদাদ সম্মেলনে তালপট্টি ইস্যুটিকে শুধু একটা বক্তব্য আকারে প্রকাশ করা হয়েছে– তাও পররাষ্ট্র সেক্রেটারির মুখ দিয়ে। কেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ইস্যুটিকে বাগদাদ সম্মেলনে প্রস্তাব আকারে পেশ করলেন না? জিয়ার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান বাগদাদ সম্মেলনের সদস্যবৃন্দকে কেন জানানো হল না যে, মুসলিম বিশ্বের বন্ধু ও সুহৃদ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়ার জীবনের শেষ আরব্ধ বিষয় ছিল এই তালপট্টি উদ্ধার এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া প্রকাশ্যে জাতির উদ্দেশে ঘোষণাও দিয়ে গেছেন যে, তালপট্টি আমাদের হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এ যদি করা হত, বাগদাদ সম্মেলনে তালপট্টি প্রস্তাব কি পাস না হয়ে পারত? কিন্তু কেন তা করা হল না। কার স্বার্থে?"

একই সংখ্যায় স্বদেশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, "আগামী সংখ্যা সচিত্র স্বদেশ জিয়া অ্যালবাম হিসেবে বেরুচ্ছে। মরহুম জিয়ার কর্মময় জীবনের প্রতিটি দিকের উপর থাকছে সচিত্র নিবন্ধ, দুর্লভ ছবি, মৃত্যু রহস্য এবং বিদ্রোহী জেনারেল মঞ্জুরের কাহিনী। গুরুত্বপূর্ণ এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।"

www.nagorikpathagar.org

এইসব তথ্যের ভিতর দিয়ে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, সেদিন কোনো পত্রিকায়ই তেমন করে লিখেনি। লিখেছে, ক্ষেত্রবিশেষে লিখতে বাধ্য হয়েছে। কারণ শহিদ জিয়ার শাহাদাতের পর দেশজুড়ে যে শোকের মাতম ওঠে এবং যে অভূতপূর্ব সংহতি সর্বত্র দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো উপায় কারো ছিল না।

তাছাড়া দৈনিক পত্রিকাগুলো মত ও পথের উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করেছে। অনেক পত্রিকা চট্টগ্রামে নিজ নিজ প্রতিবেদক পাঠিয়েছে। কিন্তু সাপ্তাহিক কাগজগুলোর মধ্যে সেদিন ব্যতিক্রম স্বদেশকে বাদ দিলে অন্যেরা নিজেদের ব্যবস্থাপনার ওপর নয়, নির্ভর করেছে দৈনিক পত্রিকা ও বাসস পরিবেশিত খবরের ওপর। সব মিলিয়ে একথা বলা যায়, সচিত্র স্বদেশের মতো দায়িত্ব, পাশাপাশি মমতা, অন্য কারো মধ্যে তেমন করে পরিলক্ষিত হয়নি।

ঢাকাকেন্দ্রিক সাপ্তাহিক কাগজগুলোর মধ্যে একমাত্র স্বদেশ নিজস্ব প্রতিবেদক ও আলোকচিত্র পাঠিয়েছে চট্টগ্রামে। তারা মিশিছে সর্বস্তরের লোকজনের সাথে। গিয়েছে রাঙ্গুনিয়ার প্রথম কবর স্থানে। জেনারেল মঞ্জুরের পলায়নের পথ তারা প্রত্যক্ষ করেছে সরেজমিনে। গ্রহণ করেছে সেই কালো রাতে শহিদ জিয়ার শেষ দর্শনার্থী ড. ইউসুফ, রাঙ্গুনিয়ার প্রথম জানাজার ইমাম মাওলানা হাবিবুর রহমান, রাঙ্গুনিয়ার ওসি আবদুর রহিম, সেকেন্ড অফিসার এ.কে.এম নুরের সাবাহ, এ.এস.আই বজলুর রহমান, মঞ্জুরের সন্ধানদাতা বনমালী আব্দুল ওয়াহিদ, গনি মিয়ার ছেলে ওসমানের সাক্ষাৎকার। ব্যাপক সফর করে শহর, চট্টগ্রাম, রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি, খই ছড়া চা বাগান, পোমরা ও পাইদং গ্রাম। এতটা কষ্ট স্বীকার সেদিন আর কেউ করেনি।

সবদিক দিয়েই দুর্লভ তথ্যের সমাহার ঘটে সচিত্র স্বদেশের জিয়া অ্যালবামে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস বিশেষ করে শহীদ জিয়ার পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনার জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে এই অ্যালবাম।

একথাও মনে রাখবার মতো, শহিদ জিয়ার ওপর প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ অ্যালবামও এই সংখ্যাটি। সচিত্র স্বদেশের আগে কেউ এতবড় কাজ করেনি। যদিও এই অ্যালবামের মধ্যেও অসম্পূর্ণতা আছে। তবুও পথিকৃতের মর্যাদা চিরকালের জন্য সচিত্র স্বদেশের পাওনা হয়ে রইল। স্বাভাবিক কারণেই এই অ্যালবামটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঐতিহাসিক।

চার

আগেই বলেছি সচিত্র স্বদেশ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯ মার্চ ১৯৮১-তে। সচিত্র সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন হিসেবে। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনি ছিল ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ববিদ্যালয়। সে সময় অন্যান্য সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের মধ্যে ছিল বিচিত্রা, রোববার ও সচিত্র সন্ধানী।

মহাকালের ধূলার তলে একে একে চাপা পড়েছে সচিত্র সন্ধানী এবং সচিত্র স্বদেশ। টিকে আছে শুধুমাত্র 'রোববার'।

আর বিচিত্রা ছিল টাইমস্ বাংলা ট্রাস্টের সম্পত্তি। এই ট্রাস্টকে ধ্বংস করে শেখ হাসিনা সরকার। তারপর বিচিত্রাকে তুলে দেয় সহোদরা শেখ রেহানার হাতে। যা এখন তার দলের লিফলেট হয়ে দিনযাপনের গ্লানি বহন করছে।

সচিত্র স্বদেশের সাইজ ছিল $১০\frac{১''}{২} \times ৭\frac{৩''}{৪}$। প্রতি সাধারণ সংখ্যার পৃষ্ঠা থাকত ৬৪। এর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন আজকের বিশিষ্ট শিল্পপতি জাকিউদ্দিন আহমদ। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন আরেক খ্যাতিমান শিল্পপতি, আজকের জাতীয় সংসদের সদস্য মোহাম্মদ মোশররফ হোসেন।

নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন রফিক ভূঁইয়া। অন্যান্যদের মধ্যে খন্দকার হাসনাত করিম ছিলেন সহযোগী সম্পাদক। ফাইজুস সালেহীন ছিলেন সহকারী সম্পাদক। আবদুল লতিফ মাসুম, ফারুক মাহমুদ ছিলেন সিনিয়র সহ-সম্পাদক। আবদুল হাই শিকদার, সৈয়দ রেজাউল করিম বেলাল, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (সৈয়দ জ্যোতি) সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার। এর পর একে একে যুক্ত হন রহমান মুখলেস, শাহীন ইসলাম এবং দেলোয়ার হোসেন।

সচিত্র স্বদেশের আলোকচিত্র সাংবাদিক ছিলেন শামসুদ্দীন চারু। শিল্প নির্দেশক আইনুল হক মুন্না। শিল্পী কৌশিক কাদের এবং আলোকচিত্র সাংবাদিক বুলবুলের হাতেখড়িও এই কাগজেই। পরে যুক্ত হন শ্রীবাস বসাক।

এ তো গেল বাইরের প্রকাশ্য দিক। স্বদেশের নেপথ্যে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাবেক রাষ্ট্রদূত আখতার-উল আলম এবং কথাশিল্পী ইউসুফ শরীফ। একটু দূর থেকে এর ভালো-মন্দের সাথে নিজেকে জড়িয়েছিলেন ড. মিজানুর রহমান শেলী। তিনি উপদেষ্টা সম্পাদকও ছিলেন কিছুদিন।

নিয়মিত লেখকের তালিকায় ছিলেন কবি আবদুল কাদির, মুজিবুর রহমান খাঁ, ওসমান গনি, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, এম, আর আখতার মুকুল, অধ্যাপক সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, আবদুস সাত্তার, কবি মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, রাহাত খান, নাজমুল

www.nagorikpathagar.org

আলম, সঙ্গীতজ্ঞ মফিজুল ইসলাম, জ্যোতির্বিদ খাজা সুজন, শহীদ আখন্দ, গিয়াস কামাল চৌধুরী, হাশিমা গুণরুখ, বারেক আবদুল্লাহ, অধ্যাপক আবু তালিব, মাফরুহা চৌধুরী, সৈয়দ হায়দার, রাজিব খন্দকার, সালাহউদ্দিন চৌধুরী, আবদুস শহিদ, আমির খশরু, গিয়াস সিদ্দিকী, রিজওয়ান-উল আলম প্রমুখ। কবি হাসান হাফিজুর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রাজিয়া মজিদ, মজনুরুল হক, আসাদ চৌধুরী, শামসুল ইসলামও বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন।

স্বদেশের পরপর ১৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় চার রঙে রঙিন মলাটে শোভিত হয়ে। ১৫তম সংখ্যা হয় দুই রঙে। এই সংখ্যাই জিয়া অ্যালবাম।

পাঁচ

সচিত্র স্বদেশের অ্যালবামের প্রচ্ছদের প্রেক্ষাপট ছিল লাল-কালো রঙের। লক্ষ লক্ষ মানুষে ভেসে যাওয়া মানিক মিয়া এভিনিউর জানাজার দৃশ্য। তারপর কালো ও সাদা রঙে সামরিক পোশাক ও ক্যাপ পরিহিত বক্তৃতারত জিয়াউর রহমানের বড় আলোকচিত্র। বাম পাশের উপরের কোনায় বড় বড় করে কালো লাল রিভার্সে লেখা :

'প্রথম বাংলাদেশ
আমার শেষ বাংলাদেশ... ।'

উপরের ডানপাশে কালো রঙে মুদ্রিত হয়েছে সচিত্র স্বদেশের নাম। নিচের ডানে কোনাকুনিভাবে ডেট লাইন ২৫ জুন ১৯৮১। অর্থাৎ, শাহাদাত বরণের ২৫ দিন পর প্রকাশিত হয় জিয়া অ্যালবাম। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৪। অ্যালবাম সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা যায় অতিরিক্ত আরও ১২ পৃষ্ঠা বাদ পড়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা যখন দেখা দিল, তখন পর্যাপ্ত সময় নেই হাতে। বাধ্য হয়ে এই ১২ পৃষ্ঠা আলাদাভাবে পরবর্তী ২ জুলাই ১৯৮১ সংখ্যায় ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়। সব মিলিয়ে জিয়া অ্যালবামের পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৬। পৃষ্ঠার অভাবে বাতিল করতে হয় অনেক পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন। মুদ্রিত হয় মাত্র ৪টি, নাভানা লিমিটেড, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন, স্টুডিও ড্যাফোডিল, ফেস্টো শিল্পগোষ্ঠীর বিজ্ঞাপন।

প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার, অনুবাদ, শোকবাণী, প্রতিক্রিয়া ও সরেজমিন প্রতিবেদনসহ মোট ১৭টি বিষয় ছিল অ্যালবামে। মোট আলোকচিত্র স্থান পায়, প্রথম সংখ্যায় ১০৬টি এবং পরের সংখ্যা ২৭টি। মোট ১৩৩টি। বুদ্ধিবৃত্তিক চক্র ১টি, হস্তাক্ষর ১টি এবং স্কেচ ১টি। সম্পাদকীয় পাতায় এদিন

www.nagorikpathagar.org

কোনো সম্পাদকীয় ছাপা হয়নি। শহিদ জিয়ার বিশাল একটা সাদা কালো ছবির নিচে কালো রিভার্সে ছাপা হয় তিনটি লাইন–

"প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ।"

ডানপাশে সিঙ্গেল কলামে ছাপা হয় সূচিপত্র। নিচে প্রিন্টার্স লাইন।

মানিক মিয়া এভিনিউতে শহীদ জিয়ার লাশ নিয়ে লক্ষ লক্ষ শোকার্ত মানুষের যে সমুদ্রের সৃষ্টি হয় জানাজায়, তার কোনো দ্বিতীয় নজির বাংলাদেশের ইতিহাসে নেই। সেদিনই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অ্যালবাম প্রকাশের। আসলে এটি ছিল সময়ের অনিবার্য দাবি। বাংলাদেশের আত্মার সেই অপ্রতিরোধ্য আকুতিতে স্বদেশ সাড়া না দিয়ে পারেনি।

মূল সরেজমিন প্রতিবেদন রচনার দায়িত্ব বর্তায় খন্দকার হাসনাত করিমের ওপর। পরদিনই আলোকচিত্র সাংবাদিক শামসুদ্দীন চারুকে সাথে করে নিয়ে তিনি চলে যান চট্টগ্রাম। এক সপ্তাহের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন এই দুটি মানুষ। ঢাকায় রাজনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়া, বিদেশি পত্রিকা, শোকবাণী সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন ফাউজুস সালেহীন, আবদুল লতিফ মাসুম, ফারুক মাহমুদ, অবদুল হাই শিকদার, শাহীন ইসলাম, রহমান মুখলেস ও দেলোয়ার হোসেন। অ্যালবাম প্রকাশের ধারণা এবং পরিকল্পনা ছিল স্বয়ং সম্পাদক এবং আখতার-উল আলমের উপর। আর কো-অডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন ইউসুফ শরীফ। সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কিংবা নির্বাহী সম্পাদক সবকিছুর সাথে আগাগোড়াই ছিলেন ওতপ্রোত।

পত্র-পত্রিকা মারফত বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এজেন্ট, হকার, গ্রাহক, পাঠকদের কাছ থেকে আসতে থাকে ক্রমাগত অতিরিক্ত কপি পাঠানোর তাড়া। স্বদেশের অন্যান্য সংখ্যার মূল্য ছিল ৩.৫০ টাকা। অ্যালবামের মূল্য রাখা হয় ৪.০০ টাকা। তারপরও বাড়তে থাকে চাহিদা। আসতে থাকে নতুন নতুন অর্ডার।

শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে সে ব্যাপারে অগ্রিম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও সম্পাদক ৫০ হাজার কপি ছাপানোর ঝুঁকি নেন। ২৫ জুন ১৯৮১ অ্যালবাম প্রকাশিত হলো। সকাল ১০টার মধ্যে রাজধানীর হকার ও এজেন্টদের সকল কপি বিক্রয় হয়ে গেল। স্বদেশ কার্যালয়ের সামনে জমে গেল রীতিমত ভিড়।

www.nagorikpathagar.org

অ্যালবাম চাই। আরো অ্যালবাম। বিকাল নাগাদ দেশের নানা স্থান থেকে আসতে থাকল টেলিফোন, টেলিগ্রাম। অ্যালবাম পাঠান। সন্ধ্যার মধ্যে আবারও ৫০ হাজার কপি অ্যালবাম ছাড়া হলো বাজারে। পরদিন আবারও একই অবস্থা। হকাররা ৪ টাকার পত্রিকা ১০ টাকায় বিক্রয় করতে থাকল। আবারও ৫০ হাজারের মতো অ্যালবাম ছাড়া হলো বাজারে। সব মিলিয়ে অ্যালবাম ছাপা হয়েছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং এর সবগুলো কপিই বিক্রি হয়ে যায়।

যেকোনো বিচারেই এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এর মধ্যে দিয়ে একদিকে বুঝা যায় শহিদ জিয়ার জন্য বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসার গভীরতা এবং তাদের দেশপ্রেম, অন্যদিকে বুঝা যায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার কমিটমেন্ট এবং সময়কে চিনবার দূরদর্শিতা। আর এর ফলে বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন সংবাদপত্রের জন্য সৃষ্টি হলো একটা রেকর্ড। যা প্রচারের দিক থেকে আজও অনতিক্রম্য রয়ে গেছে। তারপরও, দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই ঐতিহাসিক অ্যালবামটি আজও লোকচক্ষুর অন্তরালেই পড়ে আছে।

সূত্র : আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত 'সচিত্র স্বদেশ এ্যালবাম : শহীদ জিয়া'। মজিদ পাবলিকেশন্স, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০০৪

www.nagorikpathagar.org

এনসিটিবির ঘাড়ে স্যাবোটাজের ভ্যাম্পায়ার পাষণ্ড পীড়নের পথ্য প্রদান ফরমুলা

মনীষী স্টেন্স-এর কথাই আবার সত্য হলো। তিনি বলেছিলেন, 'স্বচ্ছ কাচের মধ্যেও শয়তান লুকিয়ে থাকতে পারে।' হয়তো এ কারণেই ট্রান্সসালভানিয়ার পার্বত্য জনপদের মানুষরা সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচার স্বার্থে স্বগৃহে নিরাপত্তার জন্য যুগে যুগে ব্যবহার করেছে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ভেষজ রসুন। বাড়িঘর ঝাড়পোছের প্রচলিত 'পদ্ধতির পাশাপাশি বদ্ধ ঘরের দরজা, জানালা ও ভেনটিলেটরে ঝুলিয়ে রাখত রসুন। যাতে কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়েই রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়াররা প্রবেশ করতে না পারে। এভাবেই তারা প্রতিহত করেছিল কাউন্ট ড্রাকুলার অশুভ উৎপাত। যার ওপর ভিত্তি করে ব্রাম স্টোকার প্রণয়ন করেন তার ভুবনজয়ী পিশাচ কাহিনি। এখানে সতর্কতা এবং সকল ইন্দ্রিয়কে সর্বাবস্থায় সজাগ রাখার তাগিদ ছত্রে ছত্রে। নইলে যেকোনো ছিদ্রপথে ঢুকে যেতে পারে সুতানলী সাপ।

ট্রান্সসালভানিয়ার সেই জনপদ থেকে কবেই উচ্ছেদ হয়ে গেছে ভ্যাম্পায়াররা। কিন্তু তারা যে বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তের মতো নির্মূল হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ আবারও পাওয়া গেল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অতি সাম্প্রতিক কার্যকলাপ থেকে। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্তকরণের নামে, ইতিহাস বিকৃতি রোধ করার নামে ২০০৮ সালের জন্য প্রণীত সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও ইতিহাস বইয়ের যেসব ভুল, বিকৃত, বিদ্বিষ্ট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তারা, তা এক কথায় 'ভয়াবহ'। সংগত কারণেই দেশের বিবেকবান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলতে বাধ্য হয়েছেন, তারা (এনসিটিবি) ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে দেশের বারোটা বাজানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে সরকারের সচেতন হওয়া উচিত এবং যারা অতি উৎসাহী হয়ে ইতিহাস বিকৃত করেছেন, তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত।

www.nagorikpathagar.org

বরেণ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ একে ইতিহাস বিকৃতির এক জঘন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে শনাক্ত করেছেন। ফয়েজ আহমদের মতো খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও লেখক পর্যন্ত চলমান ইতিহাসের এ ধরনের চরম বিকৃতিমূলক সংবাদে স্তম্ভিত হয়েছেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, হয় কোনো গণ্ডমূর্খকে দিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এই ইতিহাস লিখিয়েছেন অথবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করা হয়েছে। অবিলম্বে এসব বই প্রত্যাহারের আহ্বানও তিনি জানিয়েছেন। প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার বক্তব্য হলো, এ ধরনের বিষয় পাঠ্যপুস্তকে কোনো অতি উৎসাহী ব্যক্তি ঢুকিয়েছেন। এটা মনে হয় সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত নয়। এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য জনগণের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে। এটা জনস্বার্থ ও দেশের স্বার্থের পরিপন্থি। দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত অনেকেরই ধারণা, যারা এই তথ্য দিয়েছেন তারা বিভ্রান্তি দৃষ্টির জন্যই করেছেন। তারা বাংলাদেশের বন্ধু নন। তারা দেশকে ভালোবাসেন না, তারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছেন।

বিশিষ্টজনদের এসব তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও মন্তব্য যে বেঠিক নয়; তার উৎস খুঁজতে দূর যেতে হবে না। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিভেদ, নৈরাজ্য, সংঘাত, হানাহানি ও রক্তপাত থেকে দেশকে রক্ষার অজুহাত নিয়ে সংঘটিত হয় ওয়ান ইলেভেনের ঘটনা। যারা ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে হতাশ ও অসহায় বোধ করছিলেন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অবলোকন করছিলেন দেশের অস্তিত্ব বিপন্নকারী নৃশংসতম দৃশ্যগুলো, সেই সময় আশ্বাসের নামে বিভ্রান্তির বার্তা বয়ে আনে ওয়ান ইলেভেন। ধারণা দেওয়া হয় দেশের হারিয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচিতে হাত দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটনের জন্য গ্রহণ করা হয় লোক দেখানো একের পর এক কর্মসূচি। ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয় বিপন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। কোনো কাজ যথাযথ সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে বা হচ্ছে, তা নয়। জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা কিংবা সংস্কার কর্মসূচির সাফল্য একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর জন্য দরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আরো সময়।

উদ্বেগের বিষয় যেটা তা হলো, সব কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করে, সরকারের অর্জিত লাফালাফিকে ম্লান করার জন্য দেশে এবং দেশের বাইরে, সরকারের ভেতরে এবং বাইরে একটি 'বিশেষ মহল' আগাগোড়াই চালিয়ে যাচ্ছে নানামুখী জটিল-কুটিল ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের ফলেই দ্রব্যমূল্যের উল্লম্ফন রোধ করা যাচ্ছে না। চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অচিন্ত্যনীয় চাল

www.nagorikpathagar.org

সংকট। আটা ও ভোজ্য তেলের বাজারে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আগুন। বিদ্যুৎ ও সার সংকটে সবাইকে নাকাল করার জন্য চালানো হচ্ছে হাজার কৌশিশ। দেশে অস্থিরতা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে খ্যাপিয়ে তোলার অভিলাষও এর মধ্যে নিহিত আছে। আলটিমেটলি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করাই এর লক্ষ্য।

এসব অন্যায্য ও অন্যায় কর্মেরই সর্বশেষ নজির জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কীর্তি। তা পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও বিকৃতি রোধের ব্যানার সামনে ঝুলিয়ে মূলত চেয়েছে জনগণকে উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে বিব্রত ও বিতর্কিত করতে। জাতীয় ইতিহাসের মুখে সুকৌশলে কালিমা মাখতে। দেশের ভেতরে নতুন করে বিভেদ, বিদ্বেষ ও সন্দেহের বীজ বপন করতে।

এক্ষেত্রে এনসিটিবির ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা চক্রের মূল সহায়ক হয়ে উঠেছে বাইরের কালো মেঘের দল। এরা দেশ ও জাতির ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থি। নইলে সেনাপ্রধানের কথার সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের হীন ও জীর্ণ স্বার্থ ব্যবহার করে চরম দুঃসাহসের সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে চাইত না অস্বস্তি ও ক্ষোভ। পুরোনো প্রভুদের মনোরঞ্জনের সেই অতিপরিচিত 'অতিভক্তি' দেখাতে গিয়ে ইতিহাস শুদ্ধ করার নামে যে 'ভীতিকর' বাড়াবাড়ি তারা করেছে অতীতে, সেই একই প্রক্রিয়ায় ওই একই মহল এবারের কাজটিও করেছে।

সেনাপ্রধানের বক্তব্য এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে দেশের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছে বেদনা ও ক্ষোভ। কাজটি করেছে চাতুর্যের সাথে। যাতে ওই মহলটি থেকে যাবে সবসময়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর দায়দায়িত্ব বর্তাবে 'উদ্দীনীয়' সরকারের ওপর। এই দুর্বুদ্ধি ও দুরভিসন্ধি থেকেই তারা 'শহীদ'কে বানিয়েছে 'নিহত'।

স্বাধীনতার 'ঘোষক'কে বানিয়েছে 'পাঠক'। 'দেবতা'কে বানাতে চেয়েছে 'অপদেবতা'। জাতীয় নেতাদের প্রতি প্রদর্শন করেছে সীমাহীন ঔদ্ধত্য। সত্যকে গিয়েছে চেপে। মিথ্যাকে বানিয়েছে পবিত্র। এমনকি সার্কের উদ্যোক্তার অবস্থান থেকেও এক খোঁচায় বাতিল করেছে মূল দ্রষ্টাকে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন করে ঘৃণা ও হিংসার মধ্যে নিক্ষেপ করে নিজেদের নোংরা মানসিকতার সকল ছাপ মুদ্রিত করেছে পাঠ্য বইয়ে।

কী ছিল পাঠ্যবইয়ে এবং কী চেয়েছিল জাতি। সেনাপ্রধানের বক্তব্যই বা কী ছিল? কীসের ওপর ভিত্তি করে সামান্য 'কয়েকজন বিশেষজ্ঞ' আত্মঘাতী তৎপরতার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে শিক্ষাকে—তা দেখা দরকার।

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার পর থেকে যে দল যখন ক্ষমতায় গেছে, সেই দলই তার মর্জিমতো জাতীয় নেতাদের নিজ নিজ পছন্দমতো বিশেষণে বিভূষিত করেছে। যার যা প্রাপ্য তা কখনোই দেওয়া হয়নি।

ফলে প্রতিদিন স্তূপীকৃত হয়েছে অশ্রদ্ধা, অসম্মান। ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণ হয়েছে বিভ্রান্ত। কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক, এই অহেতুক জটিলতায় হাবুডুবু খেয়েছে জনগণ। বেড়ে গেছে অপ্রয়োজনীয় কাদা ছোড়াছুড়ি। বিভেদের দেওয়াল খাড়া হতে হতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এই যন্ত্রণায় জর্জরিত সাধারণ বিবেকবান সুস্থ ও শিক্ষিত মননের মানুষ চাইছিল পরিত্রাণ। কারণ তাদের সামনে দৃষ্টান্ত রয়েছে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ জাতিকে বারবার ঠেলে নিয়ে গেছে জর্জিয়া কিংবা সোমালিয়ার পথে।

এ অবস্থায় ওয়ান ইলেভেনের পর বর্তমান সরকার, বিশেষ করে সেনাপ্রধান যখন উচ্চারণ করলেন, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও আমরা আমাদের জাতীয় নেতাদের যথার্থ সম্মান দিতে পারিনি এটা ভালো কথা নয়। জাতীয় নেতাদের ইতিহাস-নির্ধারিত স্থানেই বসাতে হবে। তিনি বিশেষ করে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান প্রসঙ্গে বলেন। 'জাতির পিতা' প্রসঙ্গে জোর দেওয়ার পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার তাগিদ দেন। সেনাপ্রধানের এ বক্তব্য আমি যেভাবে বুঝেছি সেভাবেই উল্লেখ করলাম। এ প্রসঙ্গে 'আমার দেশ'-এর পাতায় এর আগেও "এনসিটিবির জাদু : 'শহীদ' হলেন নিহত" শিরোনামে লিখেছি।

সেনাপ্রধানের মনের মধ্যে কী আছে তাতো আমাদের জানবার উপায় নেই। বাহ্যত এমন কিছু ছিল না–যার অর্থ হতে পারে একজনকে সম্মান জানাতে গিয়ে অন্যকে যেন ছোট করা হয়।

সংগত কারণেই হানাহানি আর উতোরচাপানোর পীড়ায় আক্রান্ত মানুষ ধরেই নিয়েছিল এবার এসব সমস্যার সমাধান হবে। তারা খুশিও হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পরও 'স্বচ্ছ কাচের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শয়তান'রা এত বড় একটা দায়মুক্তির সুযোগকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। জাতিকে বঞ্চিত করেছে সত্য ও সৌন্দর্যের আলোতে অবগাহন থেকে।

ভুলটা কোথায় হলো? এত চেষ্টা, এত কষ্ট, এত সংস্কার– তারপরও দেখা যাচ্ছে যেখানে চোখ পড়েনি, সেখানেই আজো বহাল তবিয়তে

www.nagorikpathagar.org

বংশবৃদ্ধি করে চলেছে পুরোনো ভাইরাস। ঘরের মধ্যে একটু অন্ধকার কোণ পেলেই হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে 'মাইট' জীবাণু। এই জীবনঘাতী জীবাণু সুযোগ পেলেই দিনাজপুরের তোতা মিয়ার খামারের সাপের মতো মূল মালিককেই দংশন করে বসে।

আল-বিরুনি 'ভারততত্ত্বে' বলেছিলেন, 'মূর্খতা হলো এমন এক পাপ, সারাজীবনে যার প্রায়শ্চিত্য হয় না।' এই মূর্খতার হিমোগ্লোবিনের মধ্যে যদি মিশে যায় হিংস্রতা ও বদমতলব, তাহলে তা যে নিরাময়ের অযোগ্য হয়ে পড়ে। নইলে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবি ফররুখ আহমেদ এদের রোষ কষায়িত 'ইতরদৃষ্টি' থেকে রেহাই পেত। শুধু 'ধানের ক্ষেত' থাকার অপরাধে আবুল ফজলের মতো মুক্ত দৃষ্টির মানুষের প্রশংসাধন্য কবিতা এরা বাদ দিতে পারতেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে,

'পূণ্য ছিল এক শতাধিক
একটা ছিল পাপ,
সেই পাপে কি লুকিয়ে ছিল
জাত অজগর সাপ!'

—সেই সাপটি কি এনসিটিবির মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ঘাপটি মেরে থাকা এই 'বিশেষ মহলটি'?

কথা থেকে যায় তারপরও। এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন অন্ধ, উন্মাদের হাতে পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার এনসিটিবির কর্তারা দিলেন কীভাবে? শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি বিষয়টি জানত না?

জেনে শুনেই কি তারা বাঁদরের হাতে উদ্যান রচনার ভার দিয়েছিলেন? এটা যে মনের মাধুরী মেশানো ইতিহাস লেখার নামে পরিষ্কার 'স্যাবোটাজ', তারা কি তা এখন অনুধাবন করছেন?

যদি অনুধাবন করে থাকেন তাহলে এনসিটিবির এসব 'শাখামৃগ' গুলোকে অতি দ্রুততার সঙ্গে খাঁচায় পুরতে হবে এবং তা করতে হবে আরো বড় কোনো অশুভ ও অকল্যাণের বীজ রোপণের আগেই।

মনে রাখা জরুরি, ঘুমন্ত রাজার নাকের উপরকার মাছি তাড়ানোর ভার দেওয়া উচিত এমন কাউকে, যে মাছি তাড়ানোর ছলে নাক কেটে ফেলবে না। নইলে কোলাহল আর দক্ষযজ্ঞে অনেক ভালো কাজের মতো এই সংশোধন উদ্যোগও বেহেশতবাসী হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

'ধান বিদ্বেষী' এসব জ্ঞানপাপীর উদ্দেশ্যে বলব, ধান থাকবেই যদি ক্রোধ লাগে, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় ভাত খাওয়া বাদ দেওয়া। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশসহ হাজার বছরের বাংলা ভাষার সব কবিকে বাদ দেওয়া। কারণ এরা সবাই ধান নিয়ে অজস্র কবিতা লিখে গেছেন। আগামীতে এই 'ধানের কবিতা' নিয়ে লেখার বাসনা রইল। তবে আমার কথা একটাই, এরা পার পেয়ে যাবে না। কারণ জাতীয় কবি বলে গেছেন–

"পথের উর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা,
তাই বলে তারা উর্ধ্বে উঠেছে–কেহ কভু ভাবিও না!
উর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদের পথে হয় ওরা বাধা;
পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় নাক কাদা!
অশান্তিকামী ছলনার রূপ জয় পায় মাঝে মাঝে,
অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে!"

শেষ কথা :

পাঠ্যপুস্তকের পাতায় পাতায়, পরতে পরতে বিষ ছড়িয়ে, তথ্য ও তত্ত্বের ১০৪টি বিকৃতি সাধন করে, আপন মনের মাধুরী মেশানো সংশোধন ঘটিয়ে জনগণকে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ করে, অবশেষে গত ৭ জানুয়ারি এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ অন্য সবকিছু সম্পর্কে নিঃশব্দ থেকে, শুধু সার্ক প্রসঙ্গে দায়সারা গোছের কিছু বক্তব্য দিয়ে বলেছেন, 'তবে বই বদলানো সম্ভব নয়। শিক্ষকরা নিজ দায়িত্বেই ভুল তথ্য সংশোধন করে শ্রেণিকক্ষে সঠিক তথ্য তুলে ধরবেন। ২০০৯ সালের বইয়ে তা সংশোধন করা হবে।'

ভুল স্বীকারের কায়দাও অতি চমৎকার। চেয়ারম্যান বলছেন, 'ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করা হবে।' এক সদস্য 'কৃতকর্মের' পক্ষে সাফাই গেয়ে বলছেন, 'ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে পাঠ্যবইয়ের কোনো কিছু লেখার সুযোগ নেই।' অর্থাৎ ওনারা ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে এই 'পাপগুলো' করেননি। যা করেছেন ভেবেচিন্তেই করেছেন। আবার বলছেন, 'ভুল হলে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।' অর্থাৎ এটা যে ভুল তারা তা মানছেন না। 'যদি' হয়ে থাকে তাহলেই কেবল সংশোধনের কথা আসে। এনসিটিবির সচিব বাহাদুরের কথা থেকে বোঝা যায়, শব্দচয়নগত ভুল হয়েছে। এগুলো আর কিছু নয়।

কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন এনসিটিবি'র 'উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ' (!) জিয়াউল হাসান। তিনি যে বাণী দিয়েছেন তা এক কথায় অমৃত সমান!

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন, 'শিক্ষকরা নিজগুণে শিক্ষার্থীদের সঠিক তথ্য জানাবেন।' এ কথার অর্থ হলো, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন আর কারো কিছু করার নেই।

তাই সবকিছু শিক্ষকদের মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হলো। কর্তাদের আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই। কোথাও কেউ কোনো অন্যায় করেনি। কোথাও কোনো ষড়যন্ত্র হয়নি। ভবিষ্যতে এগুলো ঠিক করা হবে এবং যথারীতি হাসনাহেনা বেগম সাহেবান জাতীয় 'উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞরা' রয়ে গেলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এই বক্তব্য পাঠ করে আমার মনে হয়েছে পুরো বিষয়টি একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলে ৪টি বইয়ে ১০৪টি ক্ষেত্রে বিকৃতি সাধন করা সম্ভব হতো না। আর যে সাফাই কর্তৃপক্ষ গেয়েছে, তার মধ্যেও তারা তাদের 'অপরাধ' চেপে রাখতে পারেননি। যদিও অন্য সব আড়াল করে এখন কেবল 'সার্ক'কে সামনে এনে পার পাওয়ার চেষ্টা করছেন এরা। যাতে অন্য পাপগুলো পাঠ্যবইয়ে বহাল থেকে যায়।

খুব ভালো হতো যদি এসব দায়ী বা অভিযুক্ত 'উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞরা' সত্য স্বীকারের মতো শোভন কাজটি করে এনসিটিবি ছেড়ে নিজেদের আইনের হাতে তুলে দিতেন।

প্রত্নসম্পদ ফ্রান্সে পাঠানোর বিতর্কে জড়িয়ে সাবেক উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী পদত্যাগ করে যে সৎসাহস দেখিয়েছিলেন, তা যে এখানকার 'প্যারাসাইটরা' দেখাতে পারবেন না, বলাই বাহুল্য। সেজন্যই প্রত্নসম্পদের বেলায় যেমন হয়েছে, সেরকমভাবে একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি করে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে ব্যবস্থা নিতে।

আর তদন্ত কমিটির মাথায় রাখতে হবে, প্রত্নসম্পদ ফ্রান্সে পাঠানোর অতি উৎসাহী কর্মকর্তাদের চাইতে এনসিটিবি বিশেষজ্ঞদের 'কর্ম' অনেক অনেক গুরুতর ও ভয়াবহ। এ হলো চলমান সংস্কার, জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের বিরুদ্ধে সুস্থ মাথায় ঘটানো অপরাধ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, এখন থেকে ১৯০ বছর আগে, সমাজ পরিবর্তন ও সংস্কারের মহান ব্রত নিয়ে হিন্দুসমাজের সহমরণ ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় লেখালেখি ও আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তার সংস্কার আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য একজন ছিলেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। এই শাস্ত্রশকুন 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীলদের বিস্তর বাহবা কুড়িয়েছিলেন। রামমোহন ১৮২৩ সালে এই প্রগতির শত্রুদের দমনের পথ নির্দেশ করে একটা সমুচিত ব্যবস্থাপত্র দেন 'পথ্য প্রদান' রচনা করে। তারপর লেজ গুটিয়ে নিয়েছিলেন দুর্বৃত্তরা।

আমার মনে হয়, আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজকে ভাইরাসমুক্ত রাখা এবং সফল করার স্বার্থেই সেদিনের মতো, পাষণ্ড পীড়নের জন্য রামমোহনের পথ্য প্রদান পদ্ধতিই হতে পারে এখন উপযুক্ত ফরমুলা। কারণ মসৃণ পথে দৈত্য দমন হয়নি কোনোদিন।

সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ১০ জানুয়ারি ২০১০

www.nagorikpathagar.org

অবিস্মরণীয় ৭ নভেম্বর : 'আবার তোরা মানুষ হ'

এক

৭ নভেম্বর। অবিস্মরণীয়, চির অম্লান, চিরভাস্বর সিপাহি-জনতা বিপ্লবের দিন। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি প্রতিষ্ঠার দিন।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সার্বিক অর্থে অস্তিত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক তাগিদে পথে নেমে এসেছিল দেশের অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সৈনিক ও আমাদের মহান জনগণ। ১৯৭৫ থেকে অনেকটা পথ দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা দিয়েও গড়িয়ে গেছে অনেক পানি। ফ্যাসিস্ট শক্তি এই দিনটির মহিমাকে ম্লান করার জন্য চালিয়েছে হাজার কৌশিশ। ধুলির নিচে, উপেক্ষার নিচে, অবহেলা আর অপমানের নিচে এই চেতনাকে চাপা দেওয়ার জন্য চালিয়েছে নানান চক্রান্ত। রক্তচোষা বাদুড়ের মতো অশুভ ডানা বিস্তার করে কিছু পত্রিকার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী, এই ঘটনাটির পবিত্র অবয়বে কালি ও কর্দম মাখানোর জন্য নিজেদের জ্ঞান ও বিবেককে নিয়োজিত করেছে শয়তানের সেবায়।

কিন্তু কথা হলো, যে ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত আছে একটি জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন, যে ঘটনার শরীর ও আত্মা নির্মিত হয়েছে জনগণের আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে; একটি দিশাহীন, আশাহীন জাতিকে যে ঘটনা দিয়েছে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা, যে ঘটনা বিভেদ, বিদ্বেষ, হানাহানি, জিঘাংসার বিরুদ্ধে জাতিকে দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ চেতনা, সংহতি, সম্প্রীতি ও সমঝোতার মহিমান্বিত মাইলফলক, মানবিক পাটাতন, সেই ঘটনাটির প্রদীপ্ত অঙ্গীকার আলো ও আশার সম্ভাবনার আকাশকে মাটিতে নামিয়ে আনা অতটা সহজ নয়। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কেউ ভাবতে পারে বটে, আকাশ ওখানে নেমে এসেছে, আসলে সে তো ভ্রম, দৃষ্টি বিভ্রম। আবর্জনার স্তূপের মধ্যে স্বর্ণখণ্ডকে ফেলে দিয়ে কেউ পরিতৃপ্তি পেতেই পারে, তাতে তো স্বর্ণখণ্ড আবর্জনা হয়ে যায় না।

www.nagorikpathagar.org

এরপরেও কথা থেকে যায়। যে ঘটনার সাথে জাতির উত্থান, জাতিসসত্তার আত্মা ও অস্তিত্ব জড়ানো, যে বিষয়গুলো জাতিকে পূর্ণতা এনে দিয়েছে, দিয়েছে বিকশিত হওয়ার অনুপ্রেরণা, সেসব কিছু নিয়ে প্রতিনিয়ত চর্চার দরকার আছে বৈকি।

প্রতিনিয়ত অবিরল, অবিশ্রাম, অবিরাম চর্চার দরকার। দরকার এই কারণে যে, এতে জাতি হিসেবে আমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হব, প্রশিক্ষিত হব, ঋদ্ধ হব, সুদৃঢ় হব, সম্প্রসারিত হব। নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ভিতরে-বাইরে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা, আচরণ, প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো মানুষকে বাইরের বাতাস কখনও ঘরবিমুখ করতে পারে না। আবার নিজের ঘরের মালিকানা সে কখনও তুলে দেবে না অন্যের হাতে।

চর্চা এবং অবিরল চর্চা ছাড়া যে কেউ যেকোনো কিছু ভুলে যেতে পারে। নতুন তরবারি নিয়মিত ধার দিয়ে রাখতে হয়। স্বর্ণখণ্ডকেও মাঝেমধ্যে ঘঁষে সাফসুতরো করে রাখতে হয়, নইলে তার ঔজ্জ্বল্য ঢাকা পড়ে। এই কারণে বন্দুকের নল নিয়মিত পরিষ্কার করাটা জরুরি। নইলে দরকারের সময় বন্দুকটি ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে।

এমনটি এখন হয়েছে। দেশ ও জাতির শত্রুরা নভেম্বরের বিরুদ্ধে বলবেই। এ নিয়ে আফসোসের কিছু নেই। কিন্তু যারা দেশপ্রেমিক, যারা বাংলাদেশকেই তাদের প্রথম এবং শেষ ঠিকানা বলে জানেন, তারা যদি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করেন, তাহলে তো সত্যের উপর জমবে ধুলা আর মিথ্যা আধিপত্য বিস্তার করবে বহুক্ষেত্রে।

যা সচরাচর আমাদের দেশে হয়ে এসেছে। বিশেষ করে শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী বাচাল এবং চোয়ালসর্বস্ব শাসনামলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দু'উপায়েই এই মিথ্যার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অপকর্মটি হয়েছে।

ফলে আজ আমাদের জন্য জরুরি এটাই যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, এর অপরিহার্যতা, এই বিপ্লবের অন্তর্নিহিত দর্শন ও তাৎপর্য অব্যাহতভাবে তুলে ধরতে হবে। ছড়িয়ে দিতে হবে। নইলে বর্তমান জেনারেশন জানবে কোত্থেকে। আমাদের তরুণ বন্ধুরা সঠিক পথটি খুঁজে পাবে কেমন করে। দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা পাবে কোত্থেকে। দেশের জন্য আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা পাবে কোত্থেকে। কী করে বাইরের শত প্রলোভন আর লালসার হাতছানি উপেক্ষা করে নিজেকে, নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনে। স্থির হবে ঘরের কাছে, মায়ের কাছে, নিজের কাছে।

www.nagorikpathagar.org

দুই

বরেণ্য চলচ্চিত্রকার মরহুম খান আতাউর রহমান শেখ মুজিবের শাসনামলে একটি ছবি বানিয়েছিলেন। ছবিটির নাম 'আবার তোরা মানুষ হ'। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিটি ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনার সৃষ্টি করে। একদিকে এ ছবি ধারণ করে শিল্পের সবগুলো শর্ত, অন্যদিকে হয়ে ওঠে দেশপ্রেম ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ প্রামাণ্য দলিল।

ছবিটির প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে মানুষ। তারুণ্য। দুচোখে স্বপ্ন–সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত, স্বাধীন-সার্বভৌম, সুখী-সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। যেখানে কেউ কাউকে শোষণ করবে না। কেউ না খেয়ে মরবে না। অস্ত্র জমা দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা ফিরে যায় নিজ নিজ কাজে। আশা আর প্রত্যাশার দোলায় দুলছে সদ্যজাত রক্তস্নাত বাংলাদেশ।

কিন্তু পোহাইলে শর্বরী দেখা গেল যথাপূর্বক তথা পরং। দেখতে দেখতে পাকিস্তানি শোষক ও শাসকের স্থানে নিজেদের অধিষ্ঠিত করলেন শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগ। বোতলের লেভেল বদলাল বটে। ভিতরের দ্রব্যগুণ রয়ে গেল অবিকৃত।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময় আওয়ামী শোষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠনের যে অন্ধ, হিংসা উন্মত্ত, অমানবিক, অনৈতিক, অসহনীয়, দানবীয় তাণ্ডবের ভয়াল ঝঞ্ঝা বয়ে গেল দেশের ওপর দিয়ে, তাতে একদিকে যেমন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল জাতির স্বপ্ন ও আশা, অন্যদিকে একে একে ভূপাতিত হল মহান মুক্তিযুদ্ধের সবগুলো অর্জন। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, রাহাজানি, গুম, ব্যাংক ডাকাতি, বাড়ি দখল, জমি দখল, ঘুস, দুর্নীতি, লাল বাহিনী, নীল বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, চোরাচালান, ত্রাণ চুরি, রেশন চুরি, দম্ভ, অহমিকা, এক নেতা এক দেশ–সব মিলিয়ে প্রবল, প্রকট, চরম এক স্বৈরতন্ত্রের ক্রূর আঘাতের সামনে অস্থির, অচল এবং অবশ হয়ে পড়ল দেশ।

সুখ-স্বপ্নের রেশ অতি দ্রুত মিলিয়ে গেল দিগন্তে। খটখটে কঠিন ও নির্মম বাস্তবের মুখে স্তম্ভিত জাতির মধ্যে দেখা দিল হতাশা। গভীর হতাশা। এই সংকটের মোকাবিলা করার কোনো সদিচ্ছা শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগারদের ছিল বলে মনে হয় না। তারা তখন আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার নেশায় বিভোর। তাদের কাছে তখন দেশ কিংবা মানুষ বড় কথা ছিল না। বড় ছিল লাইসেন্স আর পারমিটবাজি। তারা নিজেরাই উস্কে দিল অনাচার,

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচার ও ব্যভিচারকে। অদ্ভুত মাৎস্যন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে শেখ মুজিব 'জাতির পিতা' হয়ে ক্ষমতার শিখরে জাঁকিয়ে বসে রইলেন। ফলে উচ্ছন্নে গেল সমাজ, শান্তি এবং আইন-শৃঙ্খলা। চোরাচালান আর চোরাচালান। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা সব গোল্লায় যাওয়ার অবস্থা। বন্দুক আর নকলবাজি। লাইসেন্স আর পারমিট। যার হাতে বন্দুক আছে, যে নকলে পারদর্শী সে- ই তত ক্ষমতাপূর্ণ। অচিরেই এই দুর্বিপাকের মুখে, সদ্য মুক্তিযুদ্ধফেরত ক্ষুব্ধ তরুণরা নিমজ্জিত হলো অপার যাতনায়। তারা জড়িয়ে পড়তে থাকল অপরাধের সঙ্গে, সন্ত্রাসের সঙ্গে। সে এক ঘোর দুর্দিন।

এই রকম অবস্থায় বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল তার ছাত্রদের আবার সহজ, সত্য ও সুন্দরের পথে আহ্বান করলেন। বললেন, অস্ত্র ত্যাগ করো। সন্ত্রাস বন্ধ করো। বই আর কলম হাতে তুলে নাও। তোরা ফিরে আয় জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথে। নইলে ব্যর্থ হয়ে যাবে মুক্তিযুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ। বললেন, 'আবার তোরা মানুষ হ'। তোরা মানুষ হলেই আবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সবকিছু ঠিক করার দায়িত্ব তো তোদেরই। 'আবার তোরা মানুষ হ' ছবির উপজীব্য এটাই।

বহুল আলোচিত, আলোড়িত এই চলচ্চিত্রের নামটি খান আতা রেখেছিলেন, 'আবার তোরা মানুষ হ'। মানুষ হওয়া বলতে তিনি জন্মগত আকৃতির কথা ভাবেননি এটা ধরে নেওয়া যায়, তিনি চেয়েছিলেন– শিক্ষিত, বিবেকবান, সত্যনিষ্ঠ, সংস্কৃত একদল দেশপ্রেমিক। এই বিবেকবান হওয়াটাকেই তিনি 'মানুষ হ' বলে অবিহিত করেছেন। এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, খান আতার মতো বিচক্ষণ চলচ্চিত্রকার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব 'আবার তোরা মানুষ হ' বলতে কি শুধু এটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলেন? না-কি তিনি এই নামের মাধ্যমে সনাক্ত করতে চেয়েছিলেন একটি সময়কে, একটি বিশেষ শাসনামলকে? যদি কেউ বলেন, তা নয়, তাহলে প্রশ্ন থেকে যাবে, এটা প্রামাণ্য দলিল তবে কীভাবে হয়? হ্যাঁ, এটা ছিল একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য ফিচার ফিল্ম। কিন্তু শুধু ওটুকু হলে ওই চলচ্চিত্রকে আর যাই কিছু বলা যাক, 'আবার তোরা মানুষ হ' তো বলা যায় না।

স্রেফ কয়েকজন ক্ষুব্ধ তরুণকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্যই কি ছিল খান আতার এই ব্যাপক আয়োজন? তাহলে এ ছবি কি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে অতটা গভীরভাবে ধরতে পারত? বা ধরতে চাইত?

যদি এ ছবি সময়ের দলিল হয়, তাহলে সেই সময়কে কালিমা মলিনকারী নিশ্চয়ই ওই ক'টি তরুণ ছিল না, তারা চালিকাশক্তি ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

দণ্ডমুণ্ডের কর্তাও ছিল না। ছিল ঘটনার অসহায় দর্শক। অসহায় শিকার। তাহলে খান আতা অসহায়, গুটিকয় তরুণকে কেন মানুষ হওয়ার আহ্বান জানাবেন? নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কারা দেশটাকে মানুষের বাসের অযোগ্য করে তুলছেন? কারা সদ্যজাত নবীন বিকাশমান একটি জাতিকে নিক্ষেপ করেছে হৃদয়হীন দোজখে। এই দোজখের নির্মাতা, লালনকারী এবং মালিক যদি ওই তরুণরা না হয়, তাহলে কে এর দায়দায়িত্ব বহনকারী? নিশ্চয়ই খান আতা সেই দোজখ থেকে দেশকে, দেশের মানুষকে বাইরে আনতে চেয়েছিলেন। তা যদি হয়, তাহলে এখানে মানুষ হতে হবে কাকে? আবার মানুষ বানাতে হবে কাকে? যারা তখন মানুষ ছিল তাদের? নাকি যারা মহান মুক্তিযুদ্ধোত্তর সকল অর্জনকে পদদলিত করে মানুষ থেকে পরিণত হয়েছিলেন দানবে– তাদেরকে?

মুজিবী শাসনামলে অতিষ্ঠ, অস্থির, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ কবি রফিক আজাদ একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির নাম 'ভাত দে হারামজাদা'। এখানে কার প্রতি করা হয়েছে এই উক্তি? নিশ্চয়ই দেশের ক্ষুধার্ত সাধারণ মানুষদের প্রতি নয়? ঘটনার যিনি নায়ক, তারই প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছে এই শব্দাঘাত।

আসলেই শেখ মুজিব দুঃশাসনে বাংলাদেশকে মুহ্যমান করেছিলেন, অচল ও অবশ করেছিলেন। বাংলাদেশ তখন পতিত হয়েছিল উত্থান রহিত, উদ্ধার রহিত এক ব্যর্থ, পর্যুদস্ত, পরাভূত, রাতের কারাগারে। সেখানে কোনো মানবিক চেতনার স্থান ছিল না। মনুষ্যত্ব হয়েছিল নির্বাসিত। নৈতিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রেম-প্রীতি, বাৎসল্য সর্বাংশে হয়েছিল উৎখাত। হয়তো এ কারণেই আমাদের দেশের আরেক নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন সে সময় লিখেছিলেন 'সুবচন নির্বাসনে'র মতো নাটক।

মানবাত্মার হত্যাকারী, আহাজারির মর্মবিদারী ক্ষরণ সম্পর্কে শেখ মুজিব নিজে হয়ে পড়েছিলেন উদাসীন। এতটাই উদাসীন যে নিরোর চাইতেও ভয়ংকর। ভয়ংকর বলেই তিনি সিরাজ শিকদারের মতো দেশপ্রেমিককে হত্যা করে পবিত্র সংসদে তা সদম্ভে প্রকাশ করেছিলেন। ৩০ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর রক্তে হাত রাঙাতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

শুধু তার দোষে ১০ লক্ষ মানুষ পথে, বিপথে দুর্ভিক্ষে মরে গেছে। জঠর জ্বালায় পাগল হয়ে মানুষ যখন মানুষের বমি খাচ্ছে, সেই সময় তিনি সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে তার ছেলেদের বিয়ে দিচ্ছেন। 'রক্তকরবীর' সেই আত্মবিমোহিত রাজা না হলে, কোনো সুস্থ শাসক কি এমনটি করতে পারে? যিনি আবার তার 'জাতির পিতা'।

www.nagorikpathagar.org

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সকল বিচারেই শেখ মুজিবের শাসন ছিল অমানবিক শাসন। শ্বাসরুদ্ধকর এক দানবীয় ফ্যাসিস্ট শাসন।

মানুষ চেয়েছিলেন তার হারিয়ে যাওয়া 'মানুষ' পরিচিতি ফিরে পেতে। মানুষ চেয়েছিল দুবেলা দুমুঠো ভাত। মানুষ চেয়েছিল, আবার তার কাছে ফিরে আসুক মানবিক অনুভূতি। ফিরে আসুক তার নির্বাসিত 'সুবচন'।

কিন্তু চাইলেই তো সব হয় না। উদ্ধারের সকল পথ তো রুদ্ধ করে স্ফিংসের মতো গ্যাট হয়ে বসে আছেন স্বয়ং শেখ মুজিব। সরকারি ৪টি বাদে বন্ধ করে দিয়েছিলেন সব সংবাদপত্র। নিষিদ্ধ করেছিলেন সব রাজনৈতিক দল। ঘরে আটকে বিড়ালকে মারতে থাকলেও তো নিরুপায় বিড়াল মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণকারীর ওপর। আর তখন তো সবদিক দিয়েই এক অন্ধকার কাল। এই অন্ধকারের জন্যই 'আবার তোরা মানুষ হ' কিংবা সুবচনকে ফিরিয়ে আনার আহ্বান ব্যর্থ হলো। কেউ সাড়া দিল না। ফলে যত দুঃখজনক হোক, আজ আমরা যত বেদনাহতই হই না কেন, আজ যত অনাকাঙ্ক্ষিত, যত অবাঞ্ছিতই মনে হোক না কেন, জাতি খুঁজছিল আলো, উত্তাপ। চেয়েছিল একটি পরিবর্তন।

কিন্তু ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তন ছিল অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ বলেই আধিপত্যবাদের তল্পিবাহকরা ঘটায় ৩ নভেম্বরের ঘটনা। কিন্তু বাংলাদেশ, বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনতা এবং সেনাবাহিনীর বীর সদস্যরা দেশকে পুনরায় পরপদানত করা জটিল, কুটিল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ঘটায় ঐতিহাসিক সিপাহি-জনতার বিপ্লব। ১৮৫৭ সালের সেই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, যা ইতিহাসে "সিপাহি-বিদ্রোহ" নামে পরিচিত হয়ে আছে–সেই ঘটনাটি ছাড়া, আর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া, কোনোকিছুর সাথেই তুলনা হয় না ৭ নভেম্বর। স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়া ৭ নভেম্বরেরও প্রাণ, মহানায়ক। জনগণের, জনচেতনার নায়ক।

তিন

আধিপত্যবাদ, আগ্রাসনবাদ, সকল প্রকার অশুভ ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে ৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশকে বাংলাদেশের কাছে ফিরিয়ে আনার বিপ্লব। বাংলাদেশি জাতিকে সকল বিবেচনায় বাংলাদেশি জাতিতে পরিণত করার উষালগ্ন। বিভ্রান্ত, বিপথগামী রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীদের পুনরায় মানুষ বানানোর সর্বাত্মক আয়োজন। ৭ নভেম্বর দিয়েছিল নিজের পায়ে, নিজের মতো করে দাঁড়িয়ে মুক্ত চোখে আকাশ দেখার অহংকার। ৭ নভেম্বর ঘরে

www.nagorikpathagar.org

ফেরার কথা বলেছিল। মুক্তিযুদ্ধের অপূর্ণ দিকগুলোতে দিয়েছিল পূর্ণতা। ৭ নভেম্বর একটি বিপ্লব বলেই একটি চেতনা, একটা দর্শন।

এই দর্শন ও চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের জাতিগত ও দেশগত অস্তিত্ব। সেজন্য ৭ নভেম্বরের মানে হলো উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অস্তিত্বের জন্য নিরন্তর লড়াই করা। ৭ নভেম্বর ছিল বস্তাপচা অতীতকে পেছনে ফেলে প্রসন্ন, প্রফুল্ল, স্বাস্থ্যবান ভবিষ্যৎ যাত্রাকে নিষ্কণ্টক করা। সেজন্যই অবিরল অবিশ্রাম ৭ নভেম্বর চর্চা দরকার। এই কাজটি ঠিকমতো এদ্দিন করা হয়নি বলেই জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মতো বারবার চেপে বসেছে আধিপত্যবাদের বর্ণচোরা তাবেদারদের জংলী শাসন।

জাতি সামগ্রিকভাবে ফ্যাসিস্টদের যাতনা থেকে নাজাত চেয়েছিল, মুক্তি চেয়েছিল। সেজন্যই জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিশালভাবে বিজয়ী করেছে। এখন আমাদের কাজ হবে জনগণের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন এবং নিরন্তর, অবিরাম ৭ নভেম্বরের চর্চা করা। তা যদি এবার না করা হয় তাহলে আবারও হয়তো আমাদের ঝোপেঝাড়ে ঘাপটি মেরে থাকা অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দেবে। আল্লাহ বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের মানুষকে হেফাজত করুন।

সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব, ৭ নভেম্বর ২০০১

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ এবং ৭ নভেম্বর ১৯৭৫

আমাদের ইতিহাসে মাত্র দু'বার ঘটেছিল সেই ঘটনাটি। ১৭৫৭ সালের পলাশি বিপর্যয় এবং ১৭৯৯ সালের শ্রীরঙ্গপত্তম পতনের যথাক্রমে ১০০ বছর ও ৫৮ বছর পর সারা উপমহাদেশব্যাপী ঘটেছিল প্রথম ঘটনাটি। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে প্রথম ঘটনার ১১৮ বছর পর। সাদা ইতিহাসকারদের চোখে প্রথম ঘটনা সিপাহি বিদ্রোহ। প্রাচ্যবিদরা বলছেন, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সামগ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঘটনার সময় ১৮৫৭, সূচনা বিন্দু ২৯ মার্চ ব্যারাকপুর। দ্বিতীয় ঘটনা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর, ঢাকা। ইতিহাসের এই অমর উপাখ্যান ঐতিহাসিক সিপাহি-জনতা অভ্যুত্থান দিবস বা জাতীয় সংহতি ও বিপ্লবের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মাত্র এই দু'বার আমাদের রাজনীতি, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনা অর্জন করেছিল ভিন্ন একটি মাত্রা। পেশাদার সৈনিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ, বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজের মতো, পদ্মার সঙ্গে যমুনার মতো একাকার হয়ে নেমে এসেছিল পথে।

আমাদের জাতীয় জীবনে উল্লেখ করবার মতো দিনের অভাব নেই। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর ভুবন কাঁপানো গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এ লাখ লাখ শহিদের রক্তে ভেজা অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান এবং সবশেষে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান, পাশাপাশি মজনুশাহ'র স্বাধীনতা যুদ্ধ, তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়েজী সংগ্রাম এবং দাউদ খান কররানী কিংবা ঈশা খাঁর আধিপত্যবাদী বিরোধী লড়াইও অনুল্লেখ্য কিছু না। কিন্তু ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ৭ নভেম্বর বিপ্লবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অন্যান্য দিনগুলোর চাইতে আলাদা।

বিষয়ের ভিতরে যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা তা হয়তো অন্যান্য ঘটনাশক্তির পরিপূরক কিংবা সমগোত্রীয়; কিন্তু আঙ্গিক আসলেই অন্য রকম। আরও যেটা অভিনিবেশ আকাঙ্ক্ষা করে তা হলো দুটি ঘটনার সূচনা হয়েছে একই বাংলা থেকে। একটির আঁতুড়ঘর ব্যারাকপুর, অন্যটি ঢাকা। অবশ্য একটি ছড়িয়ে পড়ে আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী, অন্যটির প্রাখর্য সাতসমুদ্র সাতাশ নদীর ওপার থেকে, দ্বিতীয় পক্ষের শত্রুদের সাথে বাইরের যোগসাজশ থাকলেও

www.nagorikpathagar.org

তারা আধিপত্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষক। উভয় পক্ষ নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছে এমন কাউকে, যিনি সর্বজনমান্য। অসাম্প্রদায়িক চেতনার ক্ষেত্রেও উভয় ঘটনা সমান লালিত।

১৮৫৭ সালের সৈনিকরা সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার কারণেই পারেনি ব্যাপক জনতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে–এ কথা বলেছি। কিন্তু ৭ নভেম্বরের সৈনিকরা বাঁধভাঙা, প্রবল, বিপুল, বিশাল, বিস্তৃত, জনজোয়ারে হয়েছে মহিমান্বিত। প্রথম ধাক্কাতেই ৭ নভেম্বরের ক্ষেত্রে সৈনিক-জনতা দাঁড়িয়েছে এক কাতারে। ভেদাভেদহীন অনির্বচনীয় এক বিশ্বাস ও লক্ষ্যে তারা এগিয়েছে বিপ্লবের দিকে। নেতৃত্বের বিভ্রান্তির কারণে বারবার থমকে গেছে ১৮৫৭ সাল। ৭ নভেম্বরের বেলায় ছিল না এই সংকট।

১৮৫৭-এর নেতা বখত খান, আজিমুল্লাহ খান, আহমদ শাহ্, ফিরোজ শাহ্, তাতিয়া টোপী, নানা সাহেব, বেগম হযরত মহল, লক্ষ্মীবাঈ যেই হোন না কেন, সত্যিকার নেতা সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। ৭ নভেম্বরের মূল চালিকাশক্তি জনতা ও সৈনিক। নেতা ছিলেন মাত্র একজন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক এবং তারুণ্যে উদ্বেল।

শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের এদেশীয় সেনাদাসদের হাতে পরাজিত হয় ১৮৫৭'র মহান সিপাহিরা। তাদের প্রাণ দিতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা ফাঁসির দড়িতে। কিন্তু ৭ নভেম্বরের পবিত্র অবয়বে কোথাও কোনো গ্লানির চিহ্ন নেই। অদ্ভুত সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত তার অঙ্গন। বিজয়ীর পালক তার শিরস্ত্রাণে। আবর্তিত হয়েছিল ৫৬ হাজার বর্গমাইলের যে শ্যামল-সবুজ-সমতল বাংলাদেশ, তাকে ঘিরে।

১৮৫৭ সালের সাথে ৭ নভেম্বরের মিল-অমিলের প্রেক্ষাপটে আলোকসম্পাতের দাবি রাখে। সাধারণ সৈনিক যাদের রাজা-উজির হওয়ার ইচ্ছে নেই, শুধু 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' স্বপ্নটুকু ছাড়া। তারা পরাধীনতায় পীড়িত বোধ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হয়েছে ক্ষোভ। স্বশাসনের অনিবার্য অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে তুচ্ছ হয়েছে প্রাণ।

সিপাহিরা অযোধ্যা, মিরাট, কানপুর, রোহিলাখণ্ড, দিল্লি, ঝাঁসি, ফয়েজাবাদ, বারাকপুর, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, গোরখপুর, ফতেগড়, শাহবাদ থেকে ছুটে গেছে দিল্লির দিকে। মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সম্রাট হিসেবে বেছে নিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে লালকিল্লার ওপরে। সাধারণ মানুষের অন্তর উদ্বেল

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে, কিন্তু ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ তাদের ছিল না। তবুও সীমিত পর্যায়ে সৈনিক-জনতা এসেছিল একই প্রান্তিকে।

৭ নভেম্বরের সূচনা সৈনিকদের হাত থেকেই। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মতো এই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ভাসমান ছিল না জনতার ওপর। বিচ্ছিন্ন কিংবা বিভক্ত ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই চেতনার রং লাল। স্বপ্ন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। প্রথম পক্ষের লক্ষ্য স্বাধীনতা উদ্ধার, দ্বিতীয় পক্ষের রক্ষা। প্রথম পক্ষের শত্রুরা এসেছে আধিপত্যবাদের বর্ম পরে। যাদের হাত নভেম্বরের রণাঙ্গনে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সৈনিক-জনতা।

এসব মিল-অমিলের মধ্যেও আরও একটি দিক বিশেষ করে মনে রাখার মতো। ১৮৫৭ সালে সারা ভারত উপমহাদেশজুড়ে যখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী, দিকে দিকে যখন দেশ মুক্তির মশাল নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছে মুক্তিপাগল সিপাহীরা–সেই সময় সারা ভারতের মাত্র একটি রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দূরে রেখেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে। শুধু দূরে রাখা নয়, সকল প্রকার রীতিনীতি, সভ্যতা, সুস্থতা ও লজ্জার মাথা খেয়ে 'বিশ্বস্ত ও বেতনভুক সেবাদাসের' মতো উপমহাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিধিরাম চালিয়ে গেছে কলম–এরা বাংলার বুদ্ধিজীবী।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এদের সময়কে 'বাংলার রেঁনেসাস' বলে অভিহিত করে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহকদের জানানো হয় শ্রদ্ধা। বাংলার বুদ্ধিজীবীকুলের স্বভাব-চরিত্র শুরু থেকেই পদলেহনকারীর ও নিকৃষ্ট। স্বাধীনতার চাইতে পরাধীনতা, ব্যক্তিত্বের চাইতে মেরুদণ্ডহীনতা–সবসময়ই প্রশ্রয় পেয়েছে তাদের কাছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম 'রাজাকার' কলকাতার ওইসব শিক্ষিত কবি, লেখক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা।

৭ নভেম্বরের বেলায়ও বুদ্ধিজীবীমহলের বিরাট অংশ ঘটিয়েছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য ও গুরুত্বকে অনুধাবন না করে উল্টা এই মহান ঘটনাটিকে কর্দমাক্ত করার জন্য তারা করেনি এহেন কাজ নেই।

কিন্তু আমাদের দেশ ও স্বাধীনতার পরম সৌভাগ্য, আমাদের জনগণ কোনো সময়ই এই বিবেক বিক্রয়কারী বুদ্ধিজীবীদের পাত্তা দেয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমাদের বীর জনতা এই বুদ্ধিজীবীদের গণনার মধ্যেই নেয়নি। নিলে যে দেশের সমূহ সর্বনাশ হতো, তা বলাই বাহুল্য।

শেষে আর একটা অমিলের কথা বলতেই হয়। ১৮৫৭ স্বাধীনতা সংগ্রামকে যত তুচ্ছতাচ্ছিল্যই করুক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা, তবুও সকল

www.nagorikpathagar.org

ভ্রূকুটিকে পাশ কাটিয়ে গেছে ইতিহাসবিদ, উপন্যাস, গবেষণা, গাঁথা ও গান। এক-দেড় শতাব্দী পরে যদিও মনে হয় আরও গভীর পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন; তবু যা পেয়েছি, তা ধ্রুবতারকার মতো জ্বলজ্বলে ও অনির্বাণ।

৭ নভেম্বর নিয়ে তেমন কাজ আজও হয়নি। নভেম্বর নিয়ে ভাসা ভাসা আলোচনা-পর্যালোচনা হলেও গভীর গ্রাহ্য গবেষণা আমরা পাইনি। ফলে এর তাৎপর্য ও গুরুত্বের সিংহভাগ রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত। এক্ষেত্রে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করে ভুল করেছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীরা। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীদের ব্যর্থতার কারণেই ৭ নভেম্বর নিয়ে রচিত হয়নি প্রামাণ্য ইতিহাস, অগ্নিগর্ভ উপন্যাস, প্রাণস্পর্শী সংগীত। অথচ এই কাজগুলো করা অত্যন্ত জরুরি।

৭ নভেম্বরের চেতনাকে যদি জাতির প্রতিদিনের জীবনযাপনের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা না যায়, যদি অনায়াস অবলম্বন না হয় সংস্কৃতির, তাহলে মাঝেমধ্যেই আধিপত্যবাদের ধারক-বাহকরা ছড়াতে সুযোগ পাবে বিভ্রান্তির বাষ্প। যা জাতির অগ্রযাত্রার ইতিহাসকে বারবার করবে ক্ষতাক্ত। আমাদের সবুজ সংসারে, পথে পথে বারবার তারা কাঁটা পুঁতে দেওয়ার পাবে সুযোগ। ১৮৫৭ সালে পরাজিত বিধ্বস্ত দিল্লি দেখে কবি মির্জা গালিব আফসোস করছেন এই বলে–

“আমার সম্মুখে দেখি বিস্তৃত উত্তাল রক্ত সমুদ্র
খোদা জানেন, আরও কত দেখতে হবে আমাকে–
শহীদ হল বন্ধু আমার হাজার হাজার, কার মৃত্যুকে আমি রাখব মনে,
আর কে শুনবে আমার এ ফরিয়াদ;
আমার মৃত্যুর পরে, কেউই থাকবে না হয়ত।
দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলবার জন্য।”

আমরা এরকম কোনো বেদনার মধ্যে পতিত হতে চাই না। সেজন্যই ৭ নভেম্বরের আনন্দ, স্বপ্ন তাৎপর্য ও গুরুত্বকে নিধিরাম চর্চা করতে হবে। ৭ নভেম্বরের বিজয় বাণীকে অঙ্গ করতে হবে জীবনের। আর এই কাজটি কেবল রাজনীতিবিদদের কাজ নয়, সংস্কৃতিকর্মীদেরও।

সূত্র : দৈনিক দিনকাল, ৭ নভেম্বর ১৯৯২

www.nagorikpathagar.org

জিয়া শহিদ জিয়া

হৃদয়ে তোমার বনপলাশের প্রাণ হু হু পর্বত
দু'চোখে ফুটেছে জোছনার ধান শীষ
বন্ধু আমার কোন পাহাড়ের নির্জনতার দেশে
বেদনার পাশে একা পড়ে আছো ব্যথিত কদমফুল

তুমি ঘুম ঘুম রাঙ্গুনিয়ার পাঁজর মথিত গান
মেঘের মোহন ডানার গহীনে জলের জঙ্গমতা
ক্রিসেন্ট লেকের পাথরে পাথরে বেদনার গোঙরানি
বাতাসে ব্যাকুল রক্তের ঝলকানি

আমার সোনার দেশ নদী আর নীলাকাশ
আমার সোনার দেশ চাষিদের ক্যাম্পাস
ঈশানের কোণে ঘন হয়েছিল শতাব্দী-বঞ্চনা
দুয়ারে দুয়ারে অন্ধকারের দেয়াল
লন্ডভন্ড বিদেশি পিশাচ বুটের শব্দ কেবল

ফকির মজনু শাহ তোমাকে ডাকি
তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তোমাকে ডাকি
ঈশা খাঁ এগারসিন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছো?
শেরে বাংলা আবুল হাশিম ভাসানী ভাসানী?

১৯৭১ সাল রক্তের বন্যা
কোথায় উদ্ধার তীর কোথায় স্বজন
নায়ক আমার
অকস্মাৎ জেগে ওঠো নূহের জাহাজ
লাফ দিয়ে ওঠে সিংহশাবক
ভুরুঙ্গামারীর প্রতি জনপদে
রৌমারী আর জাফলং থেকে
ঝড় ওঠে আসে স্বপ্ন পাহাড়
নায়ক তোমার শব্দের বরাভয়
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ নেচে ওঠে
ইথারের বুক ফেটে জেগে ওঠে কমলকলি
জেগে ওঠে দেশ মুক্তিযুদ্ধ
নায়ক আমার বুকের রক্ত মুক্তিযুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

রাত কেটে যায়। পুবের সূর্য
উঁকি দেন মাঠে কোথায় স্বদেশ?
শোষণমুক্ত সোনার সকাল?

সকালের সুখ বিকেলেই মরে যায়
মুখ কালো করে সূর্য ডুবেছে মাঠে
নতুন বর্গী লুণ্ঠন আর
কুৎসিত সব শোষণ শোষণ
নায়ক তোমার দু'চোখে কীসের পানি?

সকালের বদলে আসে জোহাকের দাঁত ঘষটানি
আসে আগ্রাসন আসে হাহাকার

হাঙর কুমির আসে মানুষ আসে না
মহামারি দুর্ভিক্ষ আসে মানুষ আসে না
গোর্কি জলোচ্ছ্বাস আসে মানুষ আসে না
বুলেট বেয়োনেট আসে মানুষ আসে না
মানুষের রক্ত মাখে মানুষের হাত
মানুষ আসে না।

তোমার বুকের মধ্যে জেগে ওঠে ভোরের আকাশ
তোমার বুকের মধ্যে জেগে ওঠে শাহজালালের আযান
তোমার বুকের মধ্যে জেগে ওঠে হানিফার তরবারি
মেঘের আর্দ্র শরীরে তোমার বিজয়ের বিদ্যুৎ
নায়ক তোমার দু'চোখের পানি মুক্তার মতো ঝরে

বাংলার আকাশ থেকে দূর হয় শকুনের ডানা
বাংলার মাদুর থেকে নেমে যায় দূষিত দানব
রক্তে রাঙানো মাঠে দুলে ওঠে সবুজ ফসল
সুপ্ত সন্তান শিয়রে রোরুদ্যমানা জননী
বহুদিন পর গোলাপের মতো হাসেন

পাখি ডাকে ফুল ফোটে
বাতাসে বাতাসে কেবল জীবন আর জীবনের কানাকানি
প্রথম এবং জীবন বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

তোমার হৃদয়ের আয়তন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল
তোমার চোখের উপমা এশিয়ার গভীর আকাশ
মাঠে ও মিলে কেবল তোমার স্বপ্নের কলরব
এতটা স্বপ্ন এমন স্বপ্ন
কে দেখেছে আর তোমার চাইতে
তোমার চাইতে বড় করে আর
কে চেয়েছে বলো বাংলাদেশ
তোমার চাইতে বেশি করে আর
কে ভালোবেসেছে বাংলাদেশ
হৃদয়ের চেয়ে টকটকে লাল
শোষণমুক্ত বাংলাদেশ

হঠাৎ গুলির শব্দ
হঠাৎ তপ্ত সিসা
চট্টলা থেকে রক্তের ছিটা তেঁতুলিয়া গিয়ে লাগে
চট্টলা থেকে রক্তের ছিটা যমুনার বুকে লাগে
পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলী সহসা মুহ্যমান
এগারো কোটি মানুষের মাটি চিৎকার করে ওঠে
আকাশ ফাটায় মানুষের আহাজারি,
এ কার রক্ত? এ কার রক্ত?
ঘাতক! ঘাতক!
নারীর জঠরে জন্ম কি তোর নয়?
–মূর্ছিত মা'র বুকের ওপরে লুটায় বাংলাদেশ!

জীবন তোমাকে ঘুমুতে দেয়নি কর্মের ব্যস্ততা
স্বপ্ন ছড়িয়ে ফিরেছো চারণ-কবি
ক্লান্তিবিহীন মানুষের যুবরাজ
ক্রিসেন্ট লেকের পাথরে পাথরে নেমেছে কি তাই ঘুম?

ঘুম নামে নাই
তোমার পৃথিবী ঘুমের সময় নাই
স্বপ্ন তোমার সারা দেশময় ওড়ে
আমরা ঘুমালে তোমার জন্য গর্জন করে সাগর
আমরা ঘুমালে তোমার স্বপ্ন পতাকায় লেগে থাকে

www.nagorikpathagar.org

তোমার জন্য আকাশে আকাশে পাখিদের কলরব
তোমার জন্য টেকনাফ জাগে সূর্য ওঠারও আগে
তোমার জন্য পদ্মার বালু বাতাসে বিরহ বোনে
তোমার জন্য ধানের গন্ধ কষ্টের মতো লাগে
তোমার জন্য সেই মেঠো পথ হৃদয় বিছিয়ে কাঁদে
তোমার জন্য কচি লাউডগা বাতাসে বিলাপ করে
তোমার জন্য পথ চেয়ে চেয়ে একা জেগে থাকে মা

নতুন কালুরঘাটের পথে আর তুমি আসবে না?

www.nagorikpathagar.org

জিয়া সঙ্গীত

গ্রামের পরেও গ্রাম, পার হয়ে আরো কত গ্রাম,
আমার হৃদয়ে তবু বাগবাড়ি নাম অবিরাম,
আয়েত আলী খার সরোদের মতো বাজে।

এ গ্রাম বিদ্রোহী কবি গজলের বাণী উড়াল,
এখানে ধানের মাঠ এলোচুলে বসেছে দাওয়ায়,
একটি স্নিগ্ধ পুকুর তার উপর মরালের গ্রীবা।

নিঝুম তাহাজ্জুদে এই গ্রাম সেজদায় নত,
এ গ্রাম জাহানারা মা পাললিক দরদে অবিরত,
তিলাওয়াত করে করে দূর করে শীতের ভীতি।
জন্ম দেয় প্রার্থিত হাজার কালের সম্প্রীতি।
সুবে সাদেকে ফোটায় টকটকে কমলের কলি,
–এ তো ঠিক গ্রাম নয় রহমতের একটি কাকলী।
সেই জন্য তীর্থ আমি আজ এই গ্রামকে বলি।

অনেক ঘটের কথা আমরা জেনেছি রীতিমতো,
সুজনবাদিয়া জানে সব ছিল পর পদানত।
কিন্তু সেই তেজ তপ্ত লাভা যেই বিপুল ইথারে–
ঘাটেরা কি ঘাটে থাকে পিছু ফেলে আলিফ লায়লারে,
পার হয় কর্ণফুলী পার হয়ে পাহাড় সাগর,
কালুরঘাটে ইতিহাস বিলি করে নয়া জাদুকর।

লিখে নয়া মহাকাব্য নয় মাস রক্ত ও রণে,
কালুরঘাট ধ্রুবতারা চিরকাল আমাদের মনে।
কালুরঘাট অনির্বাণ কালুরঘাট নয় নশ্বর,
যতবার যুদ্ধে যাব ততবার এ ঘাট অমর।

অনেক তারিখ আছে কত আর কে রাখে স্মরণে,
কিন্তু সাত নভেম্বর চিরকাল বিজয় তোরণ।
যতবার হাবুডুবু যতবার হাঙর কুমির,
যতবার আগ্রাসন কম্পন বিপন্ন ভূমির
ততবার নভেম্বর বয়ে আনে দৃপ্ত কাহিনি,
ঈশা খাঁ এগারসিন্ধু গড়ে দ্রুত অজেয় বাহিনী।

www.nagorikpathagar.org

এদেশের সব বাড়ি আজ বাগবাড়ি,
বাগবাড়ি মানে আজ আমাদের বাড়ি।
এদেশের মাঠ ঘাট সব কালুরঘাট,
সে ঘাটে ঠিকানা লেখা জিয়া সম্রাট।

যেখানে আনন্দধারা, মানুষরা পেল সম্মান,
সেই দেশ বাংলাদেশ নেতা জিয়াউর রহমান।
যেখানে বৃক্ষকে কেউ অনাদর, করে না আঘাত,
জোছনায় নিরবধি ফুটে থাকে নির্ভয় রাত,
যেখানে অনন্তকাল মেঘনার যমুনার গান,
সেই দেশ বাংলাদেশ নেতা জিয়াউর রহমান।

www.nagorikpathagar.org

সাত নভেম্বর

তিরিশ লক্ষ প্রাণ ডাক দিল মধ্যরাতে–
তোমার বাসর ঘরে ঢুকে যায় বিভেদের সাপ
আর তুমি গাঢ় ঘুমে ও বেহুলা এলোচুল বালিশে ছড়িয়ে
কাল আর ওই চোখে ভোর হবে নাকো

তোমার ছেলেরা কই চারদিকে ঘোরে বৈরী হাওয়া
হাঙর কুমির জলে
দরোজায় হিংস্র হায়েনা
তোমার বুকের খুনে পতপত প্রিয় স্বাধীনতা
তোমার দেশের মাটি তাকে ঘিরে ক্রুর দাপাদাপি
তার দুধে ভাগ চায় কোন বিভীষণ

এখনও তোমার চোখে ঘুম কেন হায়

সহসা বিদ্যুৎ ফাটে আকাশে আকাশে
অন্ধকার নিভে গেলে
চাঁদের চাঙর ভেঙে গড়ে ওঠে প্রস্তর যুগ
স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে ডেকে ওঠে বড়াইবাড়ি
স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে হাজার নদী
সবুজ সত্যে ঘেরা জনপদ ও আলোর পাহাড়

দু'চোখের ঘুম টান দিয়ে ভাঙে মহান নগর
মানুষে মানুষে এ কোন মিতালি
তিস্তা গড়াই আগুনমুখী
লাফ দিয়ে জাগে চট্টগ্রামে ক্রুদ্ধ বাতাস
ডাকাত পড়েছে যখন গাঢ় ঘুমে হিম ছিল গাঁ
এখন জোয়ার জেগে ওঠো ভাই মানুষের বাচ্চারা
জাগো দেখি ভাই ভোরের মোরগ জাগো শিমুলের ডাল
তোমাদের প্রেম অন্তরে মেখে ক্রোধ হোক আরও লাল

তিরিশ লক্ষ শহীদ ডাক দিল মধ্যরাতে

টলমল করে কেঁপে ওঠে মাটি মহানগরে
সুবেহ সাদেকের আবছা হাওয়ায় দপ করে জ্বলে

www.nagorikpathagar.org

শপথের দৃঢ় শিলায় শিলায়
মাটি ফেটে জাগে তিতুর বাহিনী
নতুন কাহিনি হাতে নিয়ে আসে
লক্ষ মানুষ
বারুদ ও গোলাপে নির্মিত হয়
এ কোন কাহিনি

সাত নভেম্বর
তোমার কণ্ঠস্বর
অজস্র বছর
স্বাধীনতা আর মানবিকতার কালবৈশাখী ঝড়
গোলাপের চেয়ে পবিত্র আর
হৃদয়ের চেয়ে প্রিয়
আমার আকাশ আমার বাতাস শিল্পিত নির্মাণ।

www.nagorikpathagar.org

জিয়া বাংলাদেশ

স্বাধীনতা যদি মাথার উপরে সোনার সূর্য হয়,
তাহলে তো তার বাণীর কণ্ঠ জিয়াই সুনিশ্চয়।
সবাধীনতা যদি তিতুমীর হয়, ঈসা খার তরবারি,
তাহলে তো তার আসল ঠিকানা আমাদের বাগবাড়ি।

স্বাধীনতা যদি রক্তের নদী, তুমুল তুফান সাগর,
তাহলে তো তার বীজতলাগুলো মানুষের অন্তর।
সেই অন্তরে যার অধিবাস অক্ষয় অব্যয়-
তিনি তো রে ভাই শহীদ জিয়া ছাড়া আর কেউ নয়।

জিয়ার জন্য মুক্তির গান পদ্মা মেঘনাকূলে,
জিয়ার জন্য যমুনার চর ভরে আছে ফুলে ফুলে।

তেরশ নদীর কূলে উপকূলে,
সহস্রাব্দের সব ফলে মূলে
সুরভিত যার প্রাণ,
সেই তো প্রথম
ফেলেছে কদম
জিয়াউর রহমান।

শহীদ জিয়া শহীদ জিয়া জিয়াউর রহমান-
জিয়া মানে দেশ এ বাংলাদেশ এক দেহ এক প্রাণ।

www.nagorikpathagar.org

প রি শি ষ্ট

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে জিয়াউর রহমানের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সহযোদ্ধা ভায়েরা,
আমি মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে দেশ ছাড়া করতে হবে।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

সূত্র : স্বাধীনতা ৭১–কাদের সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪১৮। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর–শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃ. ৫৩। স্বাধীনতা ঘোষণা–মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান। পৃ. ৪৮। এবং জিয়াউর রহমান নিজে ১৯ এপ্রিল '৭৯ চট্টগ্রামে তৎকালীন বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সৈনিকদের খেলার মাঠটিকে 'বিপ্লব উদ্যান' হিসেবে উদ্বোধনকালে বলেন, 'যতদূর মনে পড়ে রাত তখন ১১টা ৩০ মিনিট, একমাত্র আল্লাহকে ভরসা করে এবং নিজের ও সহকর্মীদের জীবনকে বাজী রেখে সমগ্র ব্যাটলিয়নের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা এই মুহূর্ত থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম এবং স্বদেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হলাম।' এই বইয়ের ২৩১ পৃষ্ঠা দেখুন। পরবর্তীতে ঈষৎ পরিবর্তন করে রেডিওতে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে জিয়াউর রহমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিন বা তার বেশি বার তাঁর ঘোষণার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেছেন। তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন... সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রেডিও স্টেশনে এলাম... প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম।... অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার নিয়েছি সে কথাও লেখা হলো। স্বাধীনতার ঘোষণা স্মারকগ্রন্থ–এস.এম. বিপাশ আনোয়ার, ধারণী সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৪।

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আমি মেজর জিয়া বলছি, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায় যুদ্ধের সমর্থন দিন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

সূত্র : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র–বেলাল মোহাম্মদ, পৃ. ৫৯। শহীদ জিয়াউর রহমান–এ কে এ ফিরোজ নুন, পৃ. ১৯। স্বাধীনতা ঘোষণা–মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান, পৃ. ৬০।

www.nagorikpathagar.org

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা
(ইংরেজি ভার্সন)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

1. I Major Zia, Provisional Commander-in-chief of the Bengal Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sk. Mujibur Rahman the independence of Bangladesh.
2. I also declare we have already formed a sovereign legal Government under Sk. Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution.
3. The new Democratic Government is committed to a policy of non alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace.
4. I appeal to all Governments to mobilise public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladeh.
5. The Government under Sk. Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world.

সূত্র : একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে-মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত ক্যাসেটে জিয়াউর রহমানের নিজস্ব কণ্ঠে ধৃত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র : তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২।

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ প্রত্যুষ :
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জিয়ার প্রথম ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী

আস্‌সালামু আলাইকুম,

আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যদের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল 'ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এই দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বত্র অফিস, আদালত, যানবাহন, বিমানবন্দর, মিলকারখানাগুলো পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ অপরাহ্ন :
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জিয়ার দ্বিতীয় ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী

আস্সালামু আলাইকুম,

বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানে অংশগ্রহণকারী সেনা, নৌ, বিমান, বিডিআর, পুলিশ ও আনসারবাহিনী ভাইদের এবং মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সৈনিকদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনীর ভাইদের স্ব স্ব কর্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তনের জন্যও আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের সর্বান্তকরণ সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য এবং আল্লাহতায়ালার উপর অবিচল আস্থা স্থাপনের জন্য আমি দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

সূত্র : দৈনিক বাংলা, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫ ইং

www.nagorikpathagar.org

ষড়যন্ত্রকারীদের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখুন

৭ নভেম্বরের সফল বিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান ও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর-উত্তম পিএসসি ১১ নভেম্বর ১৯৭৫ তৃতীয়বারের মতো জাতির উদ্দেশে রেডিও, টিভিতে ভাষণ দেন। নিম্নে তা হুবহু তুলে ধরা হলো :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী

আস্‌সালামু আলাইকুম,

সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, শ্রমিক ও সর্বস্তরের জনগণের অভূতপূর্ব সংহতির বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে গত ৭ নভেম্বর এক ইতিহাস রচিত হয়। ঐ ঘটনাবহুল দিনে আমি রেডিও বাংলাদেশের মাধ্যমে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দেশে সামরিক আইন জারি আছে।

কিন্তু প্রয়োজনীয় সময়ের অতিরিক্ত সরকার সামরিক আইন বলবৎ না রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ জাতির সামনে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ, সামরিক বাহিনীর মধ্যে একতা এবং প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি। আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি একজন সৈনিক। কতিপয় মহলের বিভিন্ন প্রচারণার সঙ্গে আমার নাম জড়িত দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক।

স্বার্থান্বেষী মহল ভুয়া পরিচয় দিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর নামে জনগণকে হয়রানি করারও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা জনগণের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব ও হতাশা সৃষ্টির হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

www.nagorikpathagar.org

সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কাছে আমার আজ বিশেষ অনুরোধ, আপনারা এই ষড়যন্ত্রকারীদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। আমি প্রতিটি নাগরিককে এই সময় সর্বান্তকরণে সরকারকে সহায়তা করার আহ্বান জানাই। দেশে সামরিক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী মহল সামরিক আইনের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশের প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে না দেয়াই এদের উদ্দেশ্য। আমাদের প্রিয় দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসী সজাগ থাকবেন বলে আমি আশা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রবিরোধীদের এই হীন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবেন।

আমার সামরিক বাহিনীর সহকর্মীবৃন্দ ও আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আপনাদের কল্যাণ এবং স্বার্থ রক্ষা করে একটি আধুনিক এবং দক্ষ বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে গড়ে তোলা।

গত ১৪ আগস্ট পর্যন্ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দুরবস্থা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন, স্বাধীনতার পর ঐদিন পর্যন্ত যেকাজ করে চলেছি। অবশেষে, আমি সর্বস্তরের জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনানীদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন কোন স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হন। জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দেশপ্রেমিক জনগণকে রাষ্ট্রবিরোধী যেকোন মহলের চাপের শিকার না হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আশাবাদী আপনারা আমাকে এবং আমার সহকর্মীবৃন্দকে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা ও সহায়তা দান করবেন।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১২ নভেম্বর ১৯৭৫ ইং

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত দেশী-বিদেশী চক্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন

২৩ নভেম্বর ১৯৭৫ রোববার গভীর রাতে সেনাবাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বেতার ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী দালালদের স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী চক্রান্ত ও বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। একই সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে দেশের আপামর জনগণের সঙ্গে সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের সম্পূর্ণ একাত্মতার কথাও ঘোষণা করেন। নিচে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সেই বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী

আসসালামু আলাইকুম,

গত ৭ই ও ১১ই নভেম্বর বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন থেকে আমি গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছি জনসাধারণ কিভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক আইন প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করছে।

এই ঘটনা সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু লোক বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় নিয়োজিত হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তি তাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এখনো সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের নাম ব্যবহার করে চলেছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমাদের নীতি পুনরায় ঘোষণা করছি। আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক। সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের প্রশাসনকে দৃঢ় ও কার্যকরী রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের এই উদ্দেশ্য হাসিলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন হস্তক্ষেপ–তা যেকোন মহল থেকেই আসুক না কেন আমরা তা বরদাস্ত করব না। আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মৌলিক প্রয়োজনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বেআইনী অস্ত্রধারীরাই এই শান্তি ও শৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রতিটি শান্তিকামী নাগরিকের কাছে আমাদের আবেদন, তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে আপনারা সহযোগিতা করুন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক জোটনিরপেক্ষ নীতির কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন, আমরা আমাদের সকল বন্ধুদের আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়–এই নীতি আমরা অনুসরণ করে চলব।

গত কয়েক মাস আমাদের জনগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সামরিক বাহিনী ও সামরিক আইন প্রশাসনের প্রতি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ ভালো করেই জানেন, কারা দেশের বন্ধু ও কারা দেশের শত্রু। কারা দেশের স্বার্থে ও কারা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত। এ সম্পর্কেও আমাদের জনগণ সজাগ রয়েছেন। জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, যারা হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত এবং যে সমস্ত বহিঃশক্তি আমাদের ধ্বংস করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

আমাদের অঙ্গীকার পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা অনেক রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছি এবং আরও অনেকে পর্যায়ক্রমে মুক্তি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন কোন মহল আমাদের এই সদিচ্ছাকে দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছেন এবং আমাদের সদিচ্ছাকে নস্যাৎ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য তারা তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কোন মহল তাদের অতীত হীন কার্যকলাপের কথা ভুলে গিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী চক্রের সঙ্গে হাত মেলানোর চেষ্টায় লিপ্ত। বহিঃশক্তির সহায়তায় এই মহল পুনরায় তৎপর হওয়ার সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় দেশবাসী! এরা কারা আমাদের তা বলে দিতে হবে না। আপনারা তা জানেন। আপনারা জানেন তারা কি করতে চায় এবং তাদের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে আসে। জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধনের জন্যই তারা তৎপর। আমরা দেশে আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দেব না, আর রক্তপাত সহ্য করব না। এরা হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী চক্র। এদের পেছনে জনসমর্থন কতটুকু তা সবার জানা আছে। আপনারা জানেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সামরিক বাহিনীর নাম পর্যন্ত ব্যবহার করছে। আমরা তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই, আমাদের সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং জনগণের ইচ্ছার সাথে ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের সামরিক বাহিনী রাজনীতির উর্ধ্বে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। যারা দেশের স্বার্থবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত তাদের সম্বন্ধেও সামরিক বাহিনী সজাগ। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় যারা জড়িত তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ, আপনারা নির্ভয়ে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। কোন মহলের হস্তক্ষেপ আপনারা বরদাস্ত করবেন না। জনগণ আপনাদের সঙ্গে। দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে আপনারা জনগণের সাথে সহায়তা করুন।

এইসব ব্যক্তিদের কঠোরহস্তে দমন করুন। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সহায়তায় বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আপনাদের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব রটিয়ে এবং প্রচারপত্র ছড়িয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের জনগণ এদের পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। আপনারা একতাবদ্ধ থাকুন। ইনশাআল্লাহ স্বার্থান্বেষী মহলের অপচেষ্টা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পরিশেষে, আমি আপনাদের জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সামরিক বাহিনী ও জনগণ এবং প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা বজায় আছে।

আমরা যদি এরূপভাবে একতাবদ্ধ থাকি, তাহলে কোন বিদেশী শক্তি বা প্রভাব আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি জাতি এবং আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে প্রতিটি নাগরিকই একটি সৈনিক। আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত বিদেশী চরদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে–তাদের সমস্ত অপচেষ্টা বাংলাদেশের বীর জনগণ নস্যাৎ করে দেবে। আমাদের মাটিতে মীরজাফরের কোন স্থান

www.nagorikpathagar.org

নেই। সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আমাদের আহ্বান, মীরজাফর এবং বিদেশী দালালদের খুঁজে বের করুন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে সক্রিয় সহায়তা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায়।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

সূত্র : দৈনিক বাংলা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ ইং

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল : ক্যাডার প্রসঙ্গে
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পূর্বকথা

আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও দলীয় সরকার শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে এই সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাল্টাব বলে দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার করেছি। আমরা অঙ্গীকার করেছি, আমরা আমাদের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করব, বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করব এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলব; মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের মূলোৎপাটন-তথা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করব এবং সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করব; ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়ে গণমুখী ও বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করব এবং জনগণের নিজের হাতেই নিজেদের শাসনভার অর্পণ করব, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে পুনর্বিন্যস্ত করব এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরব, সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, উপনিবেশবাদকে প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে নিরঙ্কুশ রাখব। শুধু কাগুজে বা মৌখিক অঙ্গীকার করেই আমরা ক্ষান্ত হইনি। ইতোমধ্যেই আমরা এ লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছি।

আমাদের নেতা ও পার্টি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান এ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "শিথিল ও ভাসমান কর্মীদের দিয়ে এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সাধন করা যাবে না। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সাধন করার জন্যে চাই ক্যাডার। আমাদের ক্যাডার গড়ে তুলতে হবে। ক্যাডারেরাই হবে পার্টির হার্ড কোর বা শিলাকেন্দ্র। ধাপে ধাপে ক্যাডারদের হাতেই ন্যস্ত হবে দলের সার্বিক নেতৃত্ব। আগামীতে পার্লামেন্টের সদস্য হবেন শুধুমাত্র ক্যাডারদেরই মধ্য থেকে। ক্যাডার ছাড়া আর কেউ ভবিষ্যতে মন্ত্রী হতে পারবেন না।'

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু কী এই ক্যাডার? সাধারণ কর্মীর সঙ্গে কী পার্থক্য ক্যাডারের। কোত্থেকে কীভাবে এই ক্যাডার গড়ে উঠবে?

এবার সে প্রসঙ্গেরই আলোচনায় আসা যাক।

ক্যাডারের সংজ্ঞা

ক্যাডার সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী নয়। আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং আদর্শের একনিষ্ঠ ও সকর্মক কর্মীই হলো ক্যাডার। যে রাজনৈতিক দলের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ নেই, সে রাজনৈতিক দলের কোনো নেতাকর্মীই ক্যাডার পদ-বাচ্য নয়। আবার আদর্শভিত্তিক পার্টিরও সকল ক্যাডার কর্মী বটে; কিন্তু সকল কর্মীই ক্যাডার নয়। একজন সত্যিকার ক্যাডার বলা যাবে তাকেই–

১. যিনি পুরোপুরি আদর্শে উদ্বুদ্ধ;

২. যিনি সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সজাগ।

৩. যিনি বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আদর্শকে বাস্তবে প্রয়োগের প্রক্রিয়া উপলব্ধি করেন।

৪. যিনি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং জনগণকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে সমর্থ।

৫. যার ব্যক্তিগত চরিত্র সমালোচনার উর্ধ্বে।

৬. যিনি বিজ্ঞানের সত্য ও যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন; যিনি গোঁড়ামিমুক্ত অথচ সুশৃঙ্খল।

৭. সর্বোপরি যাঁর ধ্যান, জ্ঞান ও ব্রত হলো আদর্শ ও পার্টি এবং যার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো আদর্শ ও পার্টির জন্য কাজ।

অন্যকথায় একটি ক্যাডার বাহিনীর মধ্যে একটি সুসংগঠিত ও সুযোগ্য সেনাবাহিনীর সকল গুণাবলিই থাকতে হবে এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে আদর্শ উদ্বুদ্ধতা এবং যুক্তিবাদিতা।

একটা সেনাবাহিনীর কাজ হলো দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা, দেশ ও জাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। একটা ক্যাডার বাহিনীর ওপর এই দায়িত্বগুলোতো থাকেই, উপরন্তু থাকে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আদর্শের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্ব। তবে সেনাবাহিনীর লড়াইয়ের কায়দা থেকে ক্যাডার বাহিনীর লড়াই করার কায়দা কিঞ্চিৎ ভিন্নতর। সেনাবাহিনী, বিশেষত বনেদি ধরনের সেনাবাহিনী জনগণ থেকে

www.nagorikpathagar.org

আলাদা হয়ে ব্যারাকে অবস্থান করে; তারা যখন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে, তখন জনগণ সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার সুযোগ পায় কিন্তু ক্যাডার বাহিনীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক হচ্ছে, মাছের সঙ্গে পানির সম্পর্কের মতো। ক্যাডার জনগণের মধ্যেই বিচরণ করে, জনগণই হয় তাদের শক্তির ভিত্তি ও উৎস, জনগণকে সঙ্গে নিয়েই তারা দেশ, জাতি ও আদর্শের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীরা জনগণের কাছে যান ওপর থেকে, নেতা হিসেবে, জনগণের একজন হিসেবে নয়। তারা জনগণের দৈনন্দিন জীবন জীবিকার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন না। কিন্তু একজন ক্যাডারকে হতে হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

অনেকে মনে করেন, নেতা ও ক্যাডার বুঝি আলাদা। যারা নেতা, তাঁদের ধারণা, যেহেতু তাঁরা নেতা সেহেতু তাঁদের ক্যাডারসুলভ গুণাবলি না থাকলেও কিছুই যায় আসে না। নিজেদের ক্যাডারসুলভ গুণাবলি না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আশা করেন যে, তাদেরই নেতৃত্বে একটা উদ্বুদ্ধ, আদর্শবান ও ত্যাগী ক্যাডার বাহিনী গড়ে উঠবে। কিন্তু এটা কস্মিনকালেও সম্ভবপর নয়।

বস্তুত পার্টি এবং সরকারের নেতাদেরও ক্যাডার হতে হবে। শুধু ক্যাডার নয়– ক্যাডারদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারাই হবেন সরকার ও পার্টির নেতা। তাই ক্যাডার হওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রথমেই শামিল হতে হবে নেতাদের। নতুবা যত কাঠখড়ই পোড়ানো হোক না কেন, নিচের দিকে ক্যাডার কোনোদিনই গড়ে উঠবে না।

যে সমাজে বহু সামাজিক অবস্থান, বহু ধরনের স্বার্থ এবং বহু মতবাদ রয়েছে, সে সমাজে রেডিমেড ক্যাডার পাওয়াতো দূরের কথা, এক লক্ষ্য এক স্বার্থসম্পন্ন কর্মী পাওয়াও সম্ভবপর নয়। এরকম সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ একটা গণ-সংগঠনে আসে বিভিন্ন কারণে, অনেক সময় স্বার্থ বা আবেগের বশে, অনেক সময় ক্ষোভের কারণে, অনেক সময় নেতার ক্যারিজমা দেখে। এরূপ পরস্পরবিরোধী চরিত্র ও স্বার্থসম্পন্ন নেতা-কর্মীদের ভেতর থেকে এক চরিত্রসম্পন্ন ও ক্যাডার গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন সঠিক ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

একটা আদর্শবান ও স্থির লক্ষ্যসম্পন্ন পার্টির ক্যাডার বাহিনীর চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না। মৌলিক বিষয়ে তাদের অবশ্যই হতে হবে এক চরিত্রসম্পন্ন ও এককেন্দ্রিক।

www.nagorikpathagar.org

ক্যাডার হলো সেই কর্মী যে দুর্দিনে পালিয়ে যায় না, সুদিনে চরিত্র হারায় না, বরং সুদিনে দুর্দিনে সমভাবেই আদর্শের জন্যে লড়াই চালিয়ে যায়।

ক্যাডার বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

ধরুন, একটা বিরাট বাজার, যেখানে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছে। এখন সুসংগঠিত ও স্থিরসংকল্প পাঁচজন মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে বাজারটা ভেঙে দেবে, তাহলে তারা কি তা পারবে না? অবশ্যই পারবে। অসংগঠিত হাজার মানুষ সংগঠিত পাঁচজন মানুষকেও ঠেকাতে পারে না।

ঠিক তেমনি লক্ষ লক্ষ ভাসমান সমর্থক ও বিভিন্নধর্মী কর্মী সংবলিত একটা আপাতত বিরাট সংগঠনকেও একটা ক্ষুদ্র অথচ সুসংগঠিত শক্তি ইচ্ছা করলেই নাজেহাল এমনকি পরাজিতও করে দিতে পারে। ঘানার নক্রুমা, উগান্ডার ইদি আমিন, ইন্দোনেশিয়ার শোকর্নো, বাংলাদেশের শেখ মুজিব প্রমুখ যতক্ষণ ক্ষমতায় ছিলেন ততক্ষণ তাঁদের কর্মী সমর্থক আর মোসাহেবের কোনোই ঘাটতি ছিল না।

জনসমাবেশ দেখে, কর্মীদের দাপট দেখে এবং মোসাহেবদের মিথ্যা অথচ হৃদয়গ্রাহী খোশামোদ শুনে তাঁদের মনে হতো যতদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য আছে ততদিন তাঁদের ক্ষমতার ইমারতে কেউই ফাটল ধরাতে পারবে না। কিন্তু হঠাৎ যেদিন তাঁরা ক্ষমতার মঞ্চ থেকে নিক্ষিপ্ত হলেন, সেদিন ওই লক্ষ লক্ষ কর্মী সমর্থক মোসাহেবদের বলতে গেলে কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। যারা সেদিন নেতার জন্যে এক লহমায় জান দেওয়ার অভিনয় করত, তারা একটা সামান্য প্রতিরোধ গড়ারও উদ্যোগ নিল না বরং অনেকে নতুন শক্তিকেই কুর্নিশ জানাল; তাদের সঙ্গেই আপস করতে সচেষ্ট হলো। এরূপ নেতাকর্মীরা কোনো অর্থেই ক্যাডার নন। এরূপ নেতাকর্মীরা পার্টি যখন ক্ষমতায় থাকে তখন ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পার্টির ক্ষতি করে, ভাবমূর্তি নষ্ট করে এবং পার্টির দুর্দিনে পালিয়ে যায়, এমনকি শত্রুপক্ষেও যোগ দেয়।

অথচ এই নেতা ও কর্মীদের ধ্যান-জ্ঞান ও ব্রত যদি আদর্শ ও পার্টি হতো অর্থাৎ তারা যদি বাস্তবিকই ক্যাডার হতেন তাহলে তারা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে এমন কোনো কাজ করতে পারতেন না যা পার্টি ও নেতৃত্বের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করে, পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং দেশ ও জাতির ক্ষতি হয়। সর্বোপরি, দুর্দিনে তারা পালিয়ে যেতেন না বরং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করতেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন।

www.nagorikpathagar.org

যেকোনো মহৎ ও স্থায়ী পরিবর্তনের জন্যে তথা বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্যে ক্যাডার বাহিনী অপরিহার্য। ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক্যাডারেরাই একদিন আল্লাহর বাণীকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সুদূর স্পেন থেকে চীন ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। আবু বকর, উমর বিন খাত্তাব, খালিদ বিন ওয়ালীদ থেকে শুরু করে সামান্য সৈনিক ও কর্মচারীটি পর্যন্ত ছিলেন ইসলামের ক্যাডার। আর এই ক্যাডারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.)। মুসা তারিকরা যেমনি, তেমনি নিজামুদ্দিন আউলিয়ারাও ছিলেন এই বাহিনীরই অন্তর্গত। ব্যক্তিগত আরামকে হারাম করে তারা দেশে দেশে পৌঁছে দিয়েছিলেন তৌহিদের বাণী, নিপীড়িত নিষ্পেষিত জনগণকে দেখিয়েছিলেন মুক্তির সিরাতুল মুস্তাকিম। আর ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে বিশেষত নেতৃত্বের মধ্যে যখনই দেখা দিল স্বার্থবুদ্ধি, মতভিন্নতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, কূপমণ্ডূকতা ও অন্ধতা, তখনই অগ্রগতির ধারা হয়ে পড়ল বিঘ্নিত ও স্তিমিত।

অনুরূপভাবে মার্কসবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক্যাডাররাই একদিন ব্যাটলশীপ পোটেমকিনের বিদ্রোহ (১৯০৩) থেকে শুরু করে ১৯১৭ সালের বিপ্লব পর্যন্ত এমনকি বিপ্লবের পরেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কাঠামোকে নির্মূল করা পর্যন্ত নিঃস্বার্থ ও সাহসী লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং রুশ সমাজকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। চীনের সমাজতান্ত্রিক ক্যাডারেরা লং মার্চের নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে কোমরের বেল্টসিদ্ধ পানি খেয়ে চিয়াং কাইশেকের বাহিনী, দখলদার জাপানি বাহিনী প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং কাজ, চরিত্র ও সাহস দিয়ে জনগণের হৃদয় জয় করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থবুদ্ধি ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, মতদ্বৈততা, বাজারের কোন্দল ইত্যাদি দেখা দিল, তখনই শুরু হলো মার্কসবাদী আন্দোলনের ভাটা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং ক্রমপরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে অনেক প্রগতিশীলই হয়ে পড়লেন বিভ্রান্তির শিকার।

একটি রাজনৈতিক সংগঠন, বিশেষত যে রাজনৈতিক সংগঠন সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করতে চায়, তাদেরকে একদিকে জয় করতে হয় আপামর জনগণের হৃদয়, অন্যদিকে মোকাবিলা করতে হয় বিপ্লবের শত্রুদের। সুবিধাবাদী, আয়েশী, অসার্বক্ষণিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন নেতা বা কর্মীরা কখনোই ঝুঁকি নেন না বরং অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করেন।

www.nagorikpathagar.org

এজন্যেই প্রয়োজন পড়ে আদর্শের সৈনিক অর্থাৎ ক্যাডারদের। ক্যাডারদের চরিত্র যত উন্নত হবে, প্রশিক্ষণ দিয়ে যতই তাদের দক্ষ করে তোলা যাবে, ততই তারা জনগণের সামনে সৎদৃষ্টান্ত বা মডেল হিসেবে অবস্থান করবেন, জনগণের মধ্যে আরও নিবিড়তর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সমর্থ হবেন, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিবর্তনে অধিকতর অবদান রাখতে পারবেন এবং আদর্শ ও জনগণের শত্রুদের মোকাবিলায় আরও বেশি পারঙ্গম হবেন।

কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ এবং আপামর জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। উভয়পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করা কোনোমতেই এবং কারোপক্ষেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং সমাজ প্রশাসন ও অর্থনীতির জঞ্জাল ও ভারসাম্যহীনতা দূর করতে হলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের জায়গায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সুদক্ষ নেতা-কর্মীদেরই অধিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মতবাদ বা পার্টির নেতা-কর্মীরা যদি আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হন এবং তারা যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন জটিলতা, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত না হন তাহলে তারা কোনোক্রমেই তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এমনকি তাদের ওপর দায়িত্ব তুলে দিলেও হয় তারা ব্যর্থ হবেন নতুবা কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গেই এক কাতার হয়ে নিজের ও গোষ্ঠীর আখের গুছিয়ে নিতে সচেষ্ট হবেন। আমাদের সামনে এরকম নজিরের কোনো অভাব নেই। বস্তুত উদ্বুদ্ধ ও সুদক্ষ নেতা-কর্মী বা ক্যাডার ছাড়া শুধু লিখিত কর্মসূচি, মহৎ ঘোষণা বা কতিপয় ব্যক্তির পরম সদিচ্ছার দ্বারা বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর নয়।

আমাদের মাননীয় পার্টি চেয়ারম্যান প্রায়শই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বা টেকনোলজিকে বুঝার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নেতৃত্ব ও ইতিহাস-সচেতন প্রতিটি ব্যক্তিই জানেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই হলো সেই জিনিস যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে ফেলেছে। সভ্য ও র‍্যাশনাল করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলেই উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নিত্যনতুন উপাদান, ঘটেছে পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তন, প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সমাজ, দেশ ও পৃথিবী। এ ধারা চলছে, চিরকালই চলবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, মুদ্রা, এমনকি সংস্কৃতি ও প্রতিরক্ষা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে।

এ যুগে পৃথিবীর ছোটবড় কোনো দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেটেড হয়ে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। ঠিক তেমনি প্রতিটি দেশ ও

www.nagorikpathagar.org

সমাজজীবনের উপাদান ও সমস্যাসমূহও একের সঙ্গে অন্যটি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যেকোনো একটি সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন বা আইসোলেটেডভাবে সমাধান করা সম্ভবপর নয়। যেমন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট দুর্নীতিকে দূর করতে হলে প্রথমেই জনগণের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের সঙ্গতি বিধান করতে হবে (নতুবা যত কড়াকড়িই করা হোক না কেন দুর্নীতি থেকে যাবেই); এটা করার জন্যে জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্যে চাই সঠিক কর্মসূচি এবং সৎ ও দক্ষ নেতা-কর্মী সম্পন্ন রাজনৈতিক পার্টি ও সরকার। আবার ধরুন একজন ব্যক্তি জীবনধারণের জন্যে দুর্নীতিতে রত থাকবে অথচ তার মন-মানস-সংস্কৃতি নির্মল ও উচ্চমানের হবে এটা অসম্ভব। তাই রক্তক্ষয়ী হোক আর শান্তিপূর্ণ হোক, আজকের যুগের বিপ্লবের নেতা-কর্মীদের জ্যাক অব অল ট্রেড মাস্টার অব নান হলে চলবে না; ঠিক তেমনি জ্যাক অব নো ট্রেড মাস্টার অব সাম হলে একজন দক্ষ টেকনোক্রাট হয়তো হওয়া যাবে কিন্তু বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া যাবে না। বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে আজ চাই চরিত্র, আদর্শ ও সার্বিক ধারণাসম্পন্ন নেতা ও কর্মী, জ্যাক অব অল ট্রেডস অ্যান্ড মাস্টার অব সাম।

এক কথায় সৎ, দক্ষ ও সার্বিক ধারণাসম্পন্ন নেতা-কর্মীই হলো ক্যাডার এবং ক্যাডার বাহিনীই হলো বিপ্লবী পরিবর্তন ও নতুন সমাজ গড়ার ক্যাটালিস্ট, পরিচালিকা শক্তি বা গাইডিং ফ্যাক্টর এবং সংরক্ষক বা প্রিজারভার।

ক্যাডার গড়ার পূর্বশর্ত

কামনা করলেই ক্যাডার গড়ে ওঠে না। আর যেকোনো পরিস্থিতিতেও ক্যাডার সৃষ্টি হয় না। ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলতে হলে চাই সঠিক পরিবেশ এবং সঠিক প্রক্রিয়া।

ক্যাডার গড়ার পূর্ব জিজ্ঞাসা হলো–কিসের জন্যে ক্যাডার? কোন পদ্ধতিতে কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ক্যাডার? যেমন ধ্রুপদি বা ক্লাসিক্যাল সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে যে ধরনের ক্যাডার চাই, লিবারেল পুঁজিবাদ কায়েমের জন্যে সে ধরনের ক্যাডারের কোনো দরকার নেই। আবার ধর্মরাষ্ট্র কায়েম করতে হলে চাই ভিন্ন ধরনের ক্যাডার। অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ধরনের ক্যাডার চাই, ফ্যাসিবাদ জ্যোতির্ময় জিয়া কায়েমের জন্যে সে ধরনের ক্যাডার অপ্রয়োজনীয়। আবার লক্ষ্য অর্জনের পথ কী হবে তার ওপরও নির্ভর করে ক্যাডারের স্বরূপ। যেমন–যারা মনে করেন সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবেন এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করবেন তাদের ক্যাডার হবে এক রকম।

www.nagorikpathagar.org

আর যাঁরা মনে করেন নিখাদ গণতন্ত্রের পথে পরম অহিংস কায়দায় লক্ষ্যে পৌঁছাবেন, তাঁদের ক্যাডার হবে ভিন্ন রকম। আবার যারা মনে করেন (ক) মূলত গণতন্ত্রের পথই অনুসরণ করব অর্থাৎ কর্মী ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেই সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লব সাধন করব, (খ) কিন্তু রাজনীতি যেহেতু নামাবলী কীর্তনমাত্র নয় সেহেতু আদর্শ, দেশ ও জাতির শত্রুদের প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও রুখব, তাদের ক্যাডার হবে ভিন্ন রকম।

পার্টির ব্যাপারেও একই কথা। এক এক লক্ষ্য ও এক এক পথের জন্যে প্রয়োজন এক এক ধরনের পার্টি।

বস্তুত কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে পার্টি ও ক্যাডার তা সুনির্দিষ্ট ও বিশদভাবে নির্ধারণ না করে ক্যাডার গড়তে চাইলে তা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

সুতরাং পার্টি বা ক্যাডার গড়তে হলে তিনটি জিনিস সুস্পষ্টভাবে এবং বিশদভাবে নির্ধারণ করতে হবে :

১. অর্থনীতি, রাজনীতি সমাজ ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমরা কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চাই। অর্থাৎ শিল্প (সরকারি, বেসরকারি), বাণিজ্য (স্থানীয় ও বৈদেশিক), সার্ভিসেস, কৃষি, আমদানি-রফতানি, অন্যান্য সম্পদের ব্যবহার, মুদ্রা ও ব্যাংকিং, আয়ের বর্তমান বৈষম্য জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যে কী তা নির্ধারণ করতে হবে। নির্ধারণ করতে হবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রশাসন পার্লামেন্টসহ বিভিন্ন গণনির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সমাজের যে স্বাভাবিক নেতৃত্ব ইত্যাদির ব্যাপারেও বা আমরা কি করতে চাইছি; অনুরূপভাবে সমাজ ও রাজনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও আমরা কোন কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চাচ্ছি তা স্পষ্ট হতে হবে।
২. উপর্যুক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে আমাদের পথ, পদ্ধতি ও ধাপসমূহ কী হবে?
৩. এই পথে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন বলে আমরা বিবেচনা করি।

এই তিনটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করা ছাড়া পার্টি বা ক্যাডার গড়ার ইচ্ছা হলো, গন্তব্যস্থল, লাইন, পয়েন্ট, জংশন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু না জেনে রেলগাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছার মতো। বস্তুত এই তিনটি বিষয়

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারণ করা ছাড়া সত্যিকার পার্টি ও ক্যাডার গড়ে তোলা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।

ক্যাডার গড়ার পদ্ধতি

স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা আপনা আপনিই ক্যাডার গড়ে ওঠে না। এর জন্যে চাই সুষ্ঠু প্রক্রিয়া যেমন–

প্রথমত, কোন পথে কোন কাঠামোর দ্বারা কোন লক্ষ্য অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে, তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, উপর্যুক্ত বিষয়ে ব্যাপক পুস্তক পুস্তিকা ও অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত করতে হবে; নেতা কর্মীদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে; তাদের মধ্যে পাঠ্যাভাস গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয়ত, লব্ধজ্ঞানকে হাতে-কলমে কাজে লাগানোর জন্যে প্রত্যেক নেতা-কর্মীর ওপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকতে হবে; প্রত্যেক নেতা-কর্মী যাতে বাস্তব কাজে যান, কাজ থেকে শিক্ষা নেন এবং সে শিক্ষাকে পুনরায় কাজে প্রয়োগ করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

চতুর্থত, পার্টির সকল পর্যায়ে সমালোচনা-আত্ম-সমালোচনার পথ উন্মুক্ত করে দিতে হবে, তারই পাশাপাশি সমালোচনার নামে চরিত্র হনন ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করবে হবে।

পঞ্চমত, নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিতে হবে। অর্থাৎ যারা আদর্শ সবচেয়ে বেশি বোঝেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেন এবং এই পরিস্থিতিতে আদর্শের প্রয়োগ-পদ্ধতি সর্বাধিক অনুধাবন করেন–তারাই যেন পার্টি ও সরকারের নেতৃত্বে আসেন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ষষ্ঠত, পার্টি ও সরকারের নেতাদের মধ্যে যেন ব্যক্তিগত জীবনে দুর্নীতিবাজ ও দুশ্চরিত্র কেউ না থাকেন তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

সপ্তমত, পার্টি ও সরকারের অভ্যন্তরে কেউ যদি ভিন্ন আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিংবা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রুপিং করেন– তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এমন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে যাতে গ্রুপবাজরা সংগঠনের মধ্যে কোনো সুবিধা করতে না পারে; এবং

অষ্টমত, পার্টিকে সরকার পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন ও পার্টির কর্মকর্তাদের দায়িত্বসম্পন্ন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

মোটকথা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জন, এই জ্ঞানকে জনগণের মধ্যে গিয়ে হাতে কলমে কাজে লাগানো এবং কলুষ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বুদ্ধির প্রতিরোধের মাধ্যমেই ক্যাডার গড়ে ওঠে। তিন ব্যক্তি কোনোদিনই ক্যাডার হবে না :

ক. **চক্রান্তবাজ :** ওয়ান্স এ কন্সপিরেটার, অলওয়েজ এ কন্সপিরেটার। যে ব্যক্তির পূর্ব ইতিহাস চক্রান্ত ও বিশ্বাসভঙ্গের সে চিরকালই তাই করবে।

খ. **দুর্নীতিবাজ :** দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি তার দুর্নীতিলব্ধ সুখ-সুবিধা সম্পদ প্রতিপত্তিকে রক্ষা করাটাকেই স্থান দেবে সকলের ওপরে এবং

গ. **কাপুরুষ :** কাপুরুষ কোনোদিনই ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না; চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে পালিয়ে যাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে চরিত্রহীন এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরও ক্যাডার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সর্বোপরি দুর্নীতিবাজ, কলুষসম্পন্ন এবং আদর্শের ব্যাপারে দুর্বল ব্যক্তিরা যতদিন পার্টি ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত উচ্চ পর্যায়ে বহাল থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত সত্যিকার ক্যাডার কোনদিই গড়ে উঠবে না।

আমাদের পরিস্থিতিতে ক্যাডারের গুরুত্ব

আমরা ঘোষণা করছি, আমরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সাধন করব। শান্তিপূর্ণ হলেও আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্য এই সমাজ, অর্থনীতি ও প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন। এই বিপ্লবের কথা আমরা যে একটা রাজনৈতিক স্টান্ট হিসেবে বলেছি তা নয়। আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের বিপ্লবী লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছি, আমরা কোন পথে এই লক্ষ্যসমূহ অর্জন করব সেটাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছি এবং এজন্যে যে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন তারও রূপরেখা প্রদান করেছি।

আমাদের লক্ষ্যসমূহ আমাদের পার্টির ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচিতে স্পষ্টরূপে বিধৃত। আমাদের নেতা চেয়ারম্যান জিয়ার বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এগুলো আরও দ্ব্যর্থহীন ও শাণিত হয়ে উঠেছে। আমাদের মূল লক্ষ্যসমূহ মোটামুটি নিম্নরূপ :

১. আমরা আমাদের জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও সার্ভিস– এই তিন সেক্টরেই সর্বোচ্চ উৎপাদন মাত্রা অর্জন করতে চাই, আমরা অর্থনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে চাই এবং এভাবে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে নিরঙ্কুশ ও অর্থবহ করে তুলতে চাই।

২. আমরা আমাদের মোট সম্পদের সুষম বন্টন সুনিশ্চিত করতে চাই–যাতে পর্যায়ক্রমে মানুষে মানুষে বিরাট ব্যবধান কমে আসে, দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ঘটে, প্রতিটি মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা-বাসস্থান সুনিশ্চিত হয় এবং সর্বোপরি মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের অবসান ঘটে।

৩. আমরা ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার স্থলে এমন প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই, যে প্রশাসনের সদস্যেরা জনগণের মালিক মোক্তার না হয়ে জনগণের প্রকৃত সেবক হবে; আমরা সর্বস্তরে, বিশেষত নিম্নতম স্তরে (গ্রাম স্তরে) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে চাই এবং এভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে চাই।

৪. বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণের প্রক্রিয়াকে বহাল রাখতে চাই। আমরা সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদ এবং তাদের তস্য সেবাদাসদের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাই। আমরা দেশে দেশে নির্যাতিত ও মুক্তিকামী জনগণের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়ার নীতি অব্যাহত রাখতে চাই।

আমরা উপর্যুক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য নিম্নলিখিত সুস্পষ্ট পথসমূহ বা রোডস্ টু-ডেস্টিনেশনের কথা উল্লেখ করছি :

১. **শান্তিপূর্ণ বিপ্লব**– অর্থাৎ জনগণের ওপর বন্দুকের জোরে চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং ব্যাপক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন ও যাবতীয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে চাই; এবং

২. **বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও উৎপাদনের রাজনীতি**– অর্থাৎ আমরা অন্ধের মতো কোন পূর্বনির্ধারিত মতবাদের দাসত্ব করতে চাই না। আমরা মতবাদে বিশ্বাসী নই; ভিন্ন দেশে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পরিবেশে সংগঠিত কোনো প্রক্রিয়া বা কর্মকাণ্ডকে আমাদের জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আমরা চাই আমাদের রাজনীতি গড়ে উঠবে আমাদের দেশের মানুষ, সম্পদ, সমস্যা,

www.nagorikpathagar.org

সম্ভাবনা, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক-ধর্মীয় ও মুক্তিযুদ্ধের বৈশিষ্ট্যেরই ভিত্তিতে।

অনুরূপভাবে আমরা আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের রূপরেখাও প্রদান করেছি। সংগঠনগুলো প্রধানত নিম্নরূপ : ক. আদর্শভিত্তিক মনোলিখিক পার্টি; এবং খ. পার্টির নেতৃত্বাধীনে সমাজের বিভিন্ন অংশ ও পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন অংগ সংগঠন।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সাধনের জন্য আমাদের মৌল প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে মোটামুটি নিম্নরূপ :

ক. পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার।

খ. সকল পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত সরকার, বিশেষত গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপক দায়িত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাম সরকার;

গ. সার্বিক সমবায় বা ব্যক্তিগত, ব্যক্তিমুখী ও স্বার্থপর উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করবে।

ঘ. গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, শহর প্রতিরক্ষা দলসহ উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত গণমিলিশিয়া; এবং

ঙ. বর্তমান ঔপনিবেশিক প্রশাসনের স্থলে গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা।

সুতরাং এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, আমাদের লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের পথ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুনির্ধারিত ও সুসমন্বিত। আজ শুধু এটা প্রয়োজন, সেটা হলো এগুলোকে আরও বিশদ করা; এগুলোকে জনগণের কাছে আরও বোধগম্য করে তোলা।

আমরা শুধু এগুলো নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হইনি, আমরা ইতোমধ্যেই এর ভিত্তিতে ব্যাপক কার্যক্রমও আরম্ভ করে দিয়েছি। যেমন–আমরা ইতোমধ্যেই স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে চলেছি, সকল পর্যায়ে সার্বিক সমবায়ের উদ্যোগ নিয়েছি, গ্রাম ও পৌর প্রতিরক্ষা দল গঠন করেছি– যার সদস্য সংখ্যা ইতোমধ্যেই ৩৫ লক্ষ মহিলাসহ এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে, সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী ও নয়া উপনিবেশবাদী শক্তি ও তাদের এজেন্টদের কবল থেকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশকে বিদেশীদের চিরায়ত বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে উৎপাদন দ্বিগুণকরণ ও সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য কাজ করে চলেছি, মহিলাদের

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটিয়ে মহিলাদের সম্মানজনক ও সমমর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করে চলেছি এবং ঘৃণা যৌতুক প্রথার মূলোৎপাটনে উদ্যোগ নিয়েছি, বিরোধী দল উপদলসমূহের মতো প্ররোচনার মুখেও জনগণের সংগঠন ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে তথা গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

শিল্প উৎপাদন ও শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনে ব্রতী হয়েছি, ধর্মান্ধতার ভিত ভেঙে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করার বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, পাঁচ বছরের মধ্যে সমগ্র জনগণকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করার জন্য ও নিপীড়িত জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য একের পর এক প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছি। তাছাড়া জমির আইল যা একদিকে জমিকে খণ্ড-বিখণ্ড ও আধুনিক চাষাবাদের অনুপযোগী করে তোলে অন্যদিকে মানুষের মন মানস, চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকেও খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ করে তোলে, সেই আইল তুলে দেওয়াসহ কৃষি ও ভূমি সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছি, হাত দিয়েছি আমাদের ভূগর্ভস্থ সম্পদ উত্তোলন, ব্যাপক খাল ও নদী খনন, গণবনায়ন ইত্যাদির ব্যাপক কর্মসূচিতে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের সুযোগ্য পার্টি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এই যে বিপুল কার্যক্রম গ্রহণ করেছি– তা এর পূর্ববর্তী কোনো দল বা সরকার কল্পনাই করতে পারেনি।

এমনিতেই এই কাজগুলো বিপুল বিরাট। তার ওপর এসমস্ত কার্যক্রম কায়েমী স্বার্থবাদী মহল, সাম্রাজ্যবাদী, নয়া-উপনিবেশবাদী, আধিপত্যবাদী শক্তি ও তাদের দেশীয় এজেন্টদের স্বার্থের ভিত্তিমূলে হানতে চলেছে প্রচণ্ড আঘাত। তাই আমাদের এই বিপ্লবী কার্যক্রমকে বানচাল করে দিতে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবে সে আর বিচিত্র কী? বুলিসর্বস্ব ও বিদেশি মদদপুষ্ট বিভিন্ন নেতা ও দল উপদল আজ বুঝতে পারছে যে, এ সমস্ত কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত হলে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; শেষ হয়ে যাবে তাদের রাজনৈতিক লীলা খেলা। তাই তারা এবং তাদের বিদেশি মুরুব্বীরা সুযোগ পেলেই আমাদের ওপর আঘাত হানতে চেষ্টা করবে।

একদিকে এই বিশাল কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করা এবং অন্যদিকে এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য চাই চরিত্রবান, উপলব্ধি ও এক চরিত্রসম্পন্ন নেতা বা কর্মীদের নিয়ে গঠিত এককেন্দ্রিক সুসংহত পার্টি। বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

চরিত্র ও মতবাদের নেতা কর্মীদের জটলা দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়–এরূপ নেতাকর্মীর সংখ্যা যত বিশালই হোক না কেন।

কিন্তু আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীদের অধিকাংশই এসেছি বিভিন্ন দল, উপদল, মতবাদ ও ঘরানা থেকে। উগ্র বামপন্থী, উগ্র ডানপন্থী, মধ্যপন্থী, ধর্মসর্বস্ব, উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী বিভিন্ন ধারা থেকে আমরা এখানে এসেছি আমাদের অবিসম্বাদিত নেতা চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান ও তাঁর আদর্শের প্রতি আস্থাশীল হয়ে। রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধারা থেকে আগত নেতাকর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা, প্রক্রিয়া, মেজাজ, প্রবণতা ইত্যাদি অনেক সময় পর্যন্ত থেকে যায়।

এমতাবস্থায়, কনসলিডেশন ও এক চরিত্রসম্পন্ন ক্যাডার গড়া প্রক্রিয়া খুব সঠিক ও জোরদার না হলে সংশ্লিষ্ট দলে গ্রুপ বা উপদলের সৃষ্টি হয় এবং দল একটি একক দল হওয়ার বদলে কতকগুলো গ্রুপ বা উপদলের ফেডারেশনে পরিণত হতে পারে। আমাদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

তাছাড়া এ ধরনের গণসংগঠন বা মাস পার্টিতে দেশি ও বিদেশি কায়েমী স্বার্থবাদীদের এজেন্টদের অনুপ্রবেশও বিচিত্র নয়। একথাও মনে রাখা দরকার যে একটা ক্ষমতাসীন দলে সকলেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসে না। কেউ কেউ আসে ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের জন্য, ক্ষমতার লোভ চরিতার্থ করার জন্য, এমনকি সাবোটাজ করার জন্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে যখন কোনো রাজনৈতিক দল আকারগত দিক থেকে খুব বড় হয়ে যায় এবং বিভিন্ন চরিত্র মতবাদ ও ঘরানার লোকের সমাবেশ ঘটে, তখন সকলকে এক চরিত্রসম্পন্ন করার জন্য অব্যাহত প্রক্রিয়া না থাকলে নিম্নলিখিত প্রবণতাগুলো দেখা দিতে পারে :

১. স্ব স্ব গ্রুপ বজায় রাখা, সততা ও যোগ্যতার বদলে গ্রুপ বা লবির জোরে অন্যদের টেক্কা দিয়ে পার্টি বা সরকারে পজিশন পাওয়ার চেষ্টা করা।

২. পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোপক্ষভাবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করা, একজনের আড়ালে তার বদনাম করা, হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা ও চরিত্র হনন করা।

www.nagorikpathagar.org

৩. বিভিন্ন গ্রুপকে প্রশ্রয় দেওয়া, এক গ্রুপকে দিয়ে অন্য গ্রুপকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করা এবং এভাবে স্ব স্ব পজিশন ঠিক বা স্থায়ী রাখার চেষ্টা করা।

৪. বাস্তবিকই কাজ করার বদলে নেতা বা নেতাদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরির মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা; নেতাদের প্রিয়ভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে সত্য গোপন করা, নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা, অন্যের কাজকে নিজের কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া, ভুল তথ্য প্রদান করা, মোসাহেবী করা ইত্যাদি।

৫. এই ভয়ে সর্বদাই ভীত থাকা যে, সত্য কথা বললে বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে অন্যায়ের প্রতিকারতো হবেই না বরং উল্টো প্রভাবশালীদের রোষানলে পড়তে হবে এবং পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত বা ভিক্টিমাইজড হতে হবে।

৬. সরকার বা পার্টির বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকলে যেনতেন প্রকারে পদ বা ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা এবং যোগ্যতর ব্যক্তিদের যে কোনোভাবে ঠেকিয়ে রাখা; আর পদে বা ক্ষমতায় না থাকলে যে কোনো মূল্যে পদ বা ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা-তদ্বির চালিয়ে যাওয়া সর্বদা ক্ষোভ হতাশা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা।

৭. আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ইত্যাদিকে বিশদভাবে উপলব্ধি করার ওপর গুরুত্ব না দেওয়া।

৮. একদিকে অন্যদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিতে না চাওয়া, অন্যদিকে দায়িত্ব পালন বা অর্জন করার চেষ্টা না করা (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একটি রাজনৈতিক পার্টির, বিশেষত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক পার্টির শত কাজের মধ্যেও যাঁরা কাজ খুঁজে পান না, শুধু দায়িত্ব ক্ষমতা বা অধিকার দেওয়া হলো না বলে আক্ষেপ করেন, তাঁদের কাঁধের ওপর থেকে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলেও তাঁরা তা পালন করতে পারবেন কি না সন্দেহ। এজন্যই বলা হয়, 'যে ব্যক্তি অন্য কেউ দায়িত্ব দেবে বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে, নিজের দায়িত্ব সৃষ্টি করে নিতে পারে না, সে আর যাই হোক নেতাই হওয়ার উপযুক্ত নয়')।

৯. রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, সংস্কৃতি ইত্যাদি যে একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত এবং একটি থেকে অন্যটিকে যে

www.nagorikpathagar.org

বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়, এ সত্য উপলব্ধি না করা এবং সমস্যাসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা।

১০. শত্রুকে খাটো করে দেখা; একথা বুঝতে পারা যে শত্রুকে তার আসল আকৃতির চেয়ে বড়ো করে দেখলে ক্ষতি নেই–কেননা তাতে সতর্কতা ও প্রতিরোধের অয়োজনটা হয় বেশি; কিন্তু শত্রুকে খাটো করে দেখলেই ঘটে বিপদ, কারণ তখনই দেখা দেয় অসতর্কতা ও শিথিলতা।

১১. নিজেদের সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস; একথা বিস্মৃত হওয়া যে পৃথিবীর বহু পরাক্রমশালী গোষ্ঠীকেও ক্ষমতা হারাতে হয়েছে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দরুন।

১২. ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, নৈতিক-বিচ্যুতি, দম্ভ, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ইত্যাদির দরুন সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কি পরিণতি হয়েছে তা বিস্মৃত হওয়া।

আমাদেরকেও এরূপ প্রবণতাসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। আমাদেরকে আরও মনে রাখতে হবে যে, বিরোধী দলসমূহের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ভয়ানক আকারে দেখা দিলেও জনগণ বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু সরকার এমনকি ক্ষমতাসীন পার্টির সামান্য দোষ-ত্রুটিও জনগণের সামনে বড় হয়ে দেখা দেয়। এর কারণ হলো এই যে ক্ষমতাসীন সরকার ও পার্টির কাছে জনগণের সরাসরি প্রত্যাশা থাকে, বিরোধী দলের কাছে তা থাকে না। তাছাড়া সরকার ও ক্ষমতাসীন পার্টির দোষ-ত্রুটি যেভাবে জাতীয় অর্থনীতি, প্রশাসন, সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি তথা দেশ ও জনগণের ক্ষতি করতে পারে বিরোধী দলসমূহের বৃহত্তর দোষ-ত্রুটিও তা করতে পারে না। সুতরাং বিরোধী দলসমূহ খারাপ প্রবণতামুক্ত না হলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না কিন্তু ক্ষমতাসীন দল ও পার্টির নেতা-নেত্রীরা খারাপ প্রবণতা থেকে মুক্ত না হলে তা দেশ ও জাতির জন্যে তো বটেই, তাঁদের নিজেদের জন্যও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

অতএব, আমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করতে হবে। ইতিহাস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন করতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে সদাপরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতিকে। সমস্যাবলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সমন্বিতভাবে দেখতে হবে। ক্ষুদ্র বা করোলারী সমস্যা নিয়ে হৈচৈ করার বদলে মূল সমস্যা খুঁজে বের করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে এবং সেখানেই সমাধানের প্রয়াস নিতে হবে। জনগণের মধ্যে আরও বেশি করে যেতে হবে এবং জনগণের কাজে প্রত্যেক নেতাকর্মীকেই হাতে কলমে অংশগ্রহণ করতে হবে। জনগণের কাছে শিখতে হবে, জনগণের ভাষা বুঝতে হবে এবং জনগণের ভাষা, বোধশক্তি, চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কথা বলতে হবে। মিথ্যাচার, ভাঁড়ামী, মোসাহেবী এবং কাজ না করে কাজের ভান ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এদের সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, নেতৃত্বকে সাবধান হতে হবে অন্যের বদনামকারী ও কূটনামীকারীদের সম্পর্কে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে এবং আমাদেরকে যেকোনো মুহূর্তে বিরোধী দলের ভূমিকায় নামতে হতে পারে এবং সে পরিস্থিতিতেও আমাদেরকে রাজনীতি করে টিকে থাকতে হবে একথা ভেবেই সংগঠন গড়তে হবে, নেতা ও ক্যাডার তৈরি করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের আদর্শ, কর্মসূচি, সংবিধান, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং নেতার প্রতি অনুগত হতে হবে। আড়ালে সমালোচনা, চরিত্রহনন ও গ্রুপিং-এর সকল প্রয়াসকে দমিয়ে দিয়ে একচরিত্রসম্পন্ন বা মনোলিথিক পার্টি গঠনের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। বলাবাহুল্য খারাপ প্রবণতাসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে সত্যিকারের ক্যাডার।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে পার্টি হচ্ছে নদীর মতো। যে নদী যত বেগবতী, সে নদীতে জঞ্জাল জমে তত কম। ঠিক তেমনি একটা পার্টির যদি ব্যাপক, প্রত্যক্ষ ও সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া না থাকে, নেতাকর্মীরা যদি উদ্যোগী কর্মঠ ও সৎসাহসী না হন এবং তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ নেতা কর্মীদের জায়গায় দক্ষতর নেতাকর্মীদের প্রতিষ্ঠা করার সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া না থাকে তাহলে সে সংগঠন বদ্ধ হতে এবং কার্যকারিতা হারাতে বাধ্য। আমাদের মাননীয় পার্টি চেয়ারম্যানের ভাষায়, পার্টিতে ইনলেট ভাল্‌ভ ও আউটলেট ভাল্‌ভ থাকতে হবে; একপথ দিয়ে নিত্যনতুন নেতাকর্মীরা প্রবেশ করবে এবং অন্যপথ দিয়ে দুর্নীতিবাজ অযোগ্য অথর্ব নেতাকর্মীরা বেরিয়ে যাবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক নেতাকর্মী মনে করেন অধ্যয়ন, আলোচনা প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় ইত্যাদির কোনোই দরকার নেই; শুধু মাঠে গিয়ে কাজ করলেই নেতা ক্যাডার তৈরি হয়ে যায় এবং সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে জনগণের মধ্যে গিয়ে হাতে-কলমে কাজ করাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং

www.nagorikpathagar.org

লাইব্রেরিতে বা ঘরে বসে পুস্তকের পর পুস্তক অধ্যয়ন করলে, সভা সেমিনারে ভাষণ দিলে, অন্যদের উপদেশ দিয়ে বেড়ালে, যত্রতত্র অন্যদের সমালোচনা করলে এবং ক্লাবে যাওয়ার মতো পার্টি অফিসে বা নেতাদের সামনে হাজিরা দিলেই নেতা-ক্যাডার হয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে, তাহলে বুঝতে হবে তাঁরাও চূড়ান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। বস্তুত নেতাকর্মীদের মধ্যে এই উভয়দিকেরই সুসমন্বয় ঘটাতে হবে। অধ্যয়ন সেমিনার ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষণ আলোচনা সমালোচনা ইত্যাদিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সত্যিকার ক্যাডারে প্রশিক্ষণ এবং জীবন দায়ী রসদ সঞ্চয়ের মূল জায়গাই হলো জনগণের মধ্যে গিয়ে হাতে কলমে কাজ ও খারাপ প্রবণতার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই।

আমাদের প্রিয় নেতা পার্টি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বলেছেন 'শুধু কেতাবী বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আদর্শ থাকলে চলবে না। বাস্তব আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে বাস্তব কর্মসূচি ও কার্যক্রম'। বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ও কার্যক্রম ব্যতিরেকে আদর্শ হবে ইউরোপীয় স্বপ্নবিলাসের মতো, শো-কেসে সাজিয়ে রাখা নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো।

এবার একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো যাক। এটা সকলেরই জানা যে, ১৯৭১ সালে ৯৩ হাজার সুপ্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সৈন্য তাদের বিপুল ও উন্নত বা সেফিসটিকেটেড অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছিল। এতো অধিক সংখ্যক সৈন্যের এভাবে আত্মসমর্পণ অস্বাভাবিক।

তবু বাস্তবে এটিই ঘটেছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে তারা একটা জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং নো ওয়ান ক্যান উইন এ ওয়ার এগেনস্ট এ নেশন। (একটা জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউই জিততে পারে না) কিন্তু তাদের পরাজয়ের আরও একটা কারণ ছিল। তা হলো, কোমরে পকেটে কারেন্সী নোট আর সোনাদানা গুঁজে রেখে, ট্রেঞ্চের মধ্যে মদ আর মেয়ে মানুষের সমারোহ করে, আর যা-ই করা যাক, যুদ্ধ করা যায় না। অথচ হানাদার পাকিস্তানিরা তাই-ই করতে চেয়েছিল।

এটাও সকলেরই জানা যে, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন, তখন বাকশাল, যুবলীগ, লালবাহিনী, গভর্নর সেক্রেটারীদের বিরাট বহর, এম.পি. মন্ত্রী ইত্যাদির কেউই তার সমর্থনে একটা ক্ষীণতম প্রতিবাদও উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়নি। এরই বা কারণ কী? কারণ হলো একবার ব্যাংক ব্যালেন্স হয়ে গেলে, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য বা ভালো চাকরি আয়ত্তে এসে গেলে বাড়ি গাড়ি আয়েশের স্বাদ একবার পেয়ে গেলে আর

www.nagorikpathagar.org

যা-ই করা যাক, জীবন বাজি রেখে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না, দেওয়া যায় না বিপ্লবী মিছিলের নেতৃত্ব। অথচ এদেশের যে অগণিত তরুণ দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য একদিন হাতে তুলে নিয়েছিল রাইফেল কারবাইন আর মেশিনগান, জীবনকে বাজি রেখে লড়েছিল শত্রুর সঙ্গে, সেই হাতেই সেদিন তারা ধরিয়ে দিয়েছিল মদের বোতল, ধরিয়ে দিয়েছিল লাইসেন্স আর পারমিটের কাগজ। ইতিহাস সাক্ষী, এই অপকর্মের ঋণ তাদের রক্ত আর জীবন দিয়েই শোধ করতে হয়েছিল।

আমাদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের কেউও যদি অর্থ সম্পদ বিলাস ব্যসন এবং বিবিধ লোভ-লালসা ও নেশার শিকার হয়ে যাই, আমাদের কারু মধ্যেও যদি ক্ষমতার মদমত্ততা দেখা দেয়, তাইলে আমাদের সেই অংশের মধ্য থেকে ক্যাডার গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে না বললেই চলে।

এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, আমাদের প্রিয় নেতা জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত চরিত্র, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠা সকল সমালোচনার উর্ধ্বে।

পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ে আরো অনেকেই রয়েছেন, যাঁদেরকে এক কথায় সৎ ও যোগ্য লোক বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, 'এ ম্যান ইজ নৌন বাইদি কম্পেনী হী কিপস' অর্থাৎ কিনা সহযোগীদের চরিত্র দিয়েই হয় যেকোনো ব্যক্তির পরিচয় তাই আজ আমাদের কেউ যদি দুর্নীতিবাজ দুশ্চরিত্র হই, ক্ষমতালোলুপ শঠ মিথ্যাবাদী হই, তাহলে তাদের পাপ ও অপকীর্তির দায়ভার আমাদের নেতাসহ প্রতিটি ভালো লোককেই বহন করতে হবে। দুর্নীতি দুশ্চরিত্রতা ও ব্যক্তি স্বার্থসর্বস্বতার ঐতিহাসিক পরিণতি থেকে আমাদের কেউই রক্ষা পাব না। অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী উভয়েরই ভাগ্য হবে একই সূত্রে গাঁথা।

সিদ্ধান্ত

আজ আমরা খাল কাটা ও খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা, গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও শিল্পবিপ্লব শুরু করেছি। আসুন, আজ আমরা এই বিপ্লবের পাশাপাশি, দেশ ও জাতির স্বার্থে আমাদের আদর্শ উদ্দেশ্যকে সফল করার স্বার্থে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলার পবিত্র বিপ্লবেরও সূচনা করি। আসুন আমরা শপথ নিই–

www.nagorikpathagar.org

- আমরা সৎ চরিত্রবান ও আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত হব।
- আমাদের সমগ্র রাজনীতিকে গভীর থেকে গভীরতরভাবে উপলব্ধি করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাব;
- ব্যাপক বিশেষত নিপীড়িত জনগণের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক প্রশাসনিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করব।
- নিজেরা অন্যায় করব না এবং দলের ভেতরে বাইরে সকল অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।
- সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ, আধিপত্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও তাদের স্থানীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাব; দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে যেকোনো মূল্যে নিরঙ্কুশ রাখব।

সার-সংকেত

পূর্বকথা : আমাদের নেতা পার্টির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেছেন যে আগামীতে ক্যাডার ছাড়া কেউ নেতা; এমপি বা মন্ত্রী হতে পারবেন না। সুতরাং ক্যাডার কী তা সকলকেই বুঝতে হবে।

ক্যাডারের সংজ্ঞা :

সকল ক্যাডারই কর্মী। কিন্তু সকল কর্মীই ক্যাডার নয়। একজন ক্যাডারের মধ্যে অন্তত ৭টি গুণ থাকতে হবে, ক্যাডারের মধ্যে থাকতে হবে একজন সৈনিকের গুণাবলি এবং সে সঙ্গে আদর্শ উদ্বুদ্ধতা ও যুক্তিবাদিতা। অনেকে মনে করেন নেতা ও ক্যাডার আলাদা। এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বস্তুত শ্রেষ্ঠ ক্যাডারেরাই হবেন সরকার ও পার্টির নেতা। এক চরিত্রসম্পন্ন ক্যাডার গড়ার জন্য চাই ছেদহীন প্রক্রিয়া। ক্যাডার দুর্দিনে পালিয়ে যায় না, সুদিনে চরিত্র হারায় না।

ক্যাডার বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

ভাসমান লক্ষ লক্ষ কর্মীর চেয়ে মুষ্টিমেয় সুসংগঠিত ক্যাডার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মপ্রচার থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি বিপ্লবী ঘটনার মূলে ছিল ক্যাডার। ক্যাডারই বিপ্লবী পরিবর্তনের পরিচালিকা শক্তি।

www.nagorikpathagar.org

ক্যাডার গড়ার পূর্বশর্ত

সত্যিকার পার্টি, নেতৃত্ব বা ক্যাডার গড়তে হলে প্রথমেই তিনটি জিনিস ঠিক করতে হবে-কোন পথে কোন কাঠামোর কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্যাডার।

ক্যাডার গড়ার পদ্ধতি

আপনা আপনিই ক্যাডার গড়ে উঠে না, তার জন্য চাই প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গত ৮টি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিন ব্যক্তি কখনো ক্যাডার হবে না চক্রান্তবাজ, দুর্নীতিবাজ ও কাপুরুষ। চরিত্রহীন ও নেশাগ্রস্তদেরও ক্যাডার হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমাদের পরিস্থিতিতে ক্যাডারের গুরুত্ব

আমাদের শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কথা কোনো স্টান্ট নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য মোটামুটি চারটি। লক্ষ্য অর্জনের পথও সুনির্দিষ্ট; এর দুটি মৌল বৈশিষ্ট্য। এজন্যে আমরা মূলত দুটি সাংগঠনিক ও পাঁচটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুনির্দিষ্ট করেছি। শুধু নির্ধারণ নয়- আমরা বাস্তব কাজও শুরু করেছি এ সম্পর্কে প্রতিটি নেতাকর্মীর সুস্পষ্ট ও ব্যাপক ধারণা থাকা দরকার।

আমাদের এই বিপ্লবী কার্যক্রম সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদীদের ও তাদের স্থানীয় এজেন্টদের ভিত্তিমূলে আঘাত হানছে। তাই তারাও আমাদের ওপর সুযোগ পেলেই আঘাত হানতে পারে। বিপ্লবকে সফল করতে হলে এবং বিপ্লবের শত্রুদের রুখতে হলে আমাদের ক্যাডার চাই-ই চাই। কিন্তু আমরা এসেছি বিভিন্ন মতবাদ ও ঘরানা থেকে।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যেকোনো দল যখন খুব বড় হয়ে যায় এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ–এমনকি এজেন্টদের পর্যন্ত সমাবেশ ঘটে, তখন সংশ্লিষ্ট দল ও সরকারে অনেকগুলো মারাত্মক প্রবণতা দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে বারোটি প্রবণতা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আমাদেরও এরূপ প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। খারাপ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ক্যাডার গড়ে উঠবে। বিরোধী দলের বড় দোষের চাইতে সরকার ও সরকারি দলের সামান্য ত্রুটিও জনগণের চোখে বেশি পড়ে। এটা বুঝতে হবে। ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে হৈচৈ না করে মূল সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে।

জনগণের কাছে যেতেই হবে, জনগণের কাছ থেকে শিখতে হবে, জনগণের ভাষায় কথা বলতে হবে। ভাঁড় ও মোসাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়াতে হবে। যারা অন্যের বদনাম ও চরিত্র হনন করে তাদের রুখতে হবে। পার্টিকে নদীর মতো গতিশীল করতে হবে। এ ব্যাপারে মাননীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বক্তব্য সর্বদা মনে রাখতে হবে। একদিকে অধ্যয়ন ও অন্যদিকে বাস্তব কাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

জানতে হবে ১৯৭১-এ ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য কেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল? কেন ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত একটি সামান্য মিছিল পর্যন্ত বেরোয়নি? বিশ্বের এরূপ ঘটনাবলি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

আমাদের মহান নেতার চরিত্র সমালোচনার উর্ধ্বে।

আমাদের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীই সৎ। কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি কেউ অসৎ, দুর্নীতিবাজ, সুশ্চরিত্র বা চক্রান্তবাজ হয়–তাহলে কুকর্মের দায় প্রতিটি ভালো লোককেও বইতে হবে। কেননা অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী উভয়েই সমান দোষী।

সিদ্ধান্ত

তাই আজ অন্তত আমাদের পাঁচটি বিষয়ে শপথ নিতে হবে। অন্যান্য বিপ্লবী কাজের সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হবে ক্যাডার গড়ার বিপ্লব।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র নিজস্ব প্রকাশনা

www.nagorikpathagar.org

১৯ এপ্রিল ১৯৮১
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডার প্রশিক্ষণ ক্লাসে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভাষণ

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ যিনি দলের নেতা ও কর্মীদের যথার্থ অর্থে 'দেশসেবক' হিসেবে তৈরি করার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সামাজিক রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তিনি এই কেন্দ্রের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন মরহুম ফিরোজ নূনকে। ধানমণ্ডিতে স্থাপিত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মূল দল, অঙ্গ দলসমূহের নেতা-কর্মী, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীসভার সদস্যদেরকেও নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতে হতো। দেশের স্থবির ও গণবিমুখ রাজনীতিতে এই কেন্দ্র সত্যিকার অর্থেই গুণগত ও মানগত পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কর্মীরা জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নয়নে রাখতে শুরু করেছিল ইতিবাচক ভূমিকা। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজেও নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর শাহাদাৎ বরণের পর এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়।

ছাত্র ভাইয়েরা, আজকে আপনারা যেটা করছেন এখানে সেটা হলো রাজনৈতিক ক্লাস। আমাদের পার্টি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, এই দলের রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে কিন্তু এই দর্শন আমাদের পার্টির নেতৃবর্গ তারা এখনও ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন নাই। যার ফলে আমাদের পার্টির যেভাবে বিকাশ ঘটা উচিত সেইভাবে বিকাশ ঘটছে না। এই পার্টি সরকার পরিচালনা করছে, যারা এই পার্টিতে রয়েছেন তারা অনেকেই মনে করেন আমরা এই পার্টিতে রয়েছি সেই পার্টি সরকার পরিচালনা করছে; আছেই তো সবকিছু কি দরকার আছে। কিন্তু আমরা যে পর্যায়ে পৌঁছেছি, সেইখানে আমাদের মধ্যে যারা নেতৃবর্গ রয়েছেন তাদের আমাদের রাজনৈতিক দর্শন সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে সুস্পষ্টভাবে যদি জ্ঞান না থাকে তবে এ পার্টির লক্ষ্য, চরম লক্ষ্য শোষণমুক্ত সমাজ যেটা আপনারা বলছেন এটা বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর নয়। আজকে আমাদের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদেরকে কেবলমাত্র বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের নীতিরীতিতে, দর্শনে

www.nagorikpathagar.org

কেবলমাত্র বিশ্বাস করলেই চলবে না, সেই দর্শন বুঝতে হবে এবং কেবলমাত্র বিশ্বাস করলেই হবে না অন্যদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে। সেই নেতৃবর্গ কোন অঙ্গদলেরই হোক, মূল দলেরই হোক যতক্ষণ না এই কয়েকটি ব্যাপারে যে সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় না হবে সে নিজেও কিছু করতে পারবে না, দলকেও সাহায্য করতে পারবে না এবং দেশেরও কোনো মঙ্গল করতে পারবে না।

আমরা অনেকে এতদিন হুজুগের ঠেলায় রাজনীতি করেছি। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে সব দলই হুজুগের ঠেলায় কাজ করেছে। ১৯৪৭ সালের আগে মুসলিম লীগ, ১৯৪৭ সালের পর অন্যান্য দল এবং আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সাল এ হুজুগের রাজনীতি করেছে। ১৯৭০-৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতার জন্য, কিন্তু যে দল নেতৃত্ব দিয়েছিল সে দলকে না বুঝে জনগণ তাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিকভাবে, রাজনৈতিক কর্মসূচির দিক দিয়ে সেসব বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। একটা সাধারণ ব্যাপার আপনারা লক্ষ্য করেছেন গতকালের খবরের কাগজে উঠেছে, যে আওয়ামী লীগের লোকেরা মুজিব নগরে তারা তাদের মিটিং করেছে যেখানে ১৯৭১ সালে ১৭ই এপ্রিল সরকার গঠিত হয়েছিল। খুব ভাল কথা। কিন্তু এটা কি কেউ আপনারা ভিতরে ঢুকে গভীরভাবে দেখেছেন ব্যাপারটা কী? তারা এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে সরকার গঠন করল কেন? এটার জবাব কেউ দিতে পারবেন না। তার কারণ আমরা হুজুগে রাজনীতি করেছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা আমরা জানি। আমরা অনেক সময় অনেক কিছু বলি না, কিংবা ধীরে ধীরে তাদের এক একটি যে সিক্রেসি রয়েছে সেগুলো আমরা বের করি।

আপনারা জানেন যে, ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ চায় নাই, স্বাধীনতার যুদ্ধ চায় নাই, পাকিস্তানের মধ্যেই তারা ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিল। সেইজন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য তাদের কোন প্লান-প্রোগ্রাম ছিল না। তারা তো মার্চ মাসের ২৫ তারিখে ডিক্লারেশন দিয়েছিল যে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে ২৮ তারিখে আওয়ামী লীগের মিটিং হবে। তাই যদি হয় তাহলে সেই স্বাধীনতা ডাকের প্রশ্নই উঠে না এবং যার ফলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ২৫ তারিখে রাত্রের বেলায় যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করল তখন আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, যে ড. কামাল হোসেন আজকে এত বড় বড় কথা বলছেন তিনি পাকিস্তানীদের কাছে নিজে ধরা দিলেন এবং তাদের নেতা শেখ সাহেবকেও ধরিয়ে দিলেন, এটাতো সকলেই জানেন। আওয়ামী লীগের সকলে আজকে হজম করে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তাদের মনের মধ্যে তাদের নেতার জন্য যদি এত দরদ

www.nagorikpathagar.org

থাকত তা হলে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করত। যে ব্যক্তি আজকে আওয়ামী লীগকে চালাচ্ছে, যে ব্যক্তি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তাদের নেতাকে পাকিস্তানের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিল এবং সে নিজেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং পুরা স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকিস্তানে অতিবাহিত করল সে আবার আওয়ামী লীগকে ডিরেকশন দিচ্ছে। তা হলে বুঝতে পারবেন ব্যাপারটি কী, আওয়ামী লীগের রাজনীতি কোথায়, রাজনীতির ডিরেকশন কোথায় থেকে আসে।

এগুলো বুঝতে হবে আপনাদেরকে। আপনারা জানেন তাদের যদি স্বাধীনতার প্লান-প্রোগ্রাম থাকত তাহলে তাদের নেতৃবর্গ ২৫ তারিখে যুদ্ধে নেমে যেত, পালিয়ে আওয়ামী যেত না এবং সরকার ২৫ তারিখেই গঠন করত। অথবা ২৬, ২৭, ২৮ কিংবা ৩০ তারিখে কিন্তু এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে কেন? তা হলে বুঝা যাচ্ছে যে, লীগের রাজনৈতিক কোনো দর্শনই ছিল না।

চরম লক্ষ্য ছিল না। স্বাধীনতার পরে তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলল, সংবিধানে বানিয়ে ফেলল এবং সেই ব্যক্তি যিনি তার নেতাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি বুলডোজ করে এই কনস্টিটিউশন করলেন এবং তিনি থাকাকালীন ১৯৭৫ সালে সেই বহুদলীয় গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে রাতারাতি জনগণের কাছে রেফারেন্ডাম না দিয়ে তারা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করল। যে পার্টিতে রাতারাতি তাদের ঘোষণাপত্র তাদের কর্মসূচি রদবদল করতে পারে, করতে হয়, তাহলে বুঝেন তাদের হুকুম কোথা থেকে আসে, হুকুমনামা কোথা থেকে আসে। আমাদের দেশে আরো বিভিন্ন পার্টি তাদের সম্বন্ধে আমি পরে বলবো।

এই যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এ তো আজকের নয়, ১০ বছর আগেকারও নয়, এদেশ কোনদিন স্বাধীন ছিল না এইভাবে। বিভিন্ন সময় শত শত বছর আগে রাজা বাদশরা বিভিন্ন জায়গায় থেকে এসে বাংলাদেশের এই বর্তমান এলাকা দখল করে নিজেরা নিজেদের রাজত্বের ডিক্লারেশন দিয়েছিল সেটা আলাদা ব্যাপার। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, বাংলাদেশের একটি খুবই স্ট্র্যাটেজিক অর্থাৎ কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। যার ফলে হাজার হাজার বছর ধরে বিদেশী সম্প্রসারণবাদীদের লক্ষ্য বাংলাদেশের উপর ছিল। আপনারা বাংলাদেশের ইতিহাস পড়লে দেখবেন যে বিভিন্ন সময়ে এই উপমহাদেশে বিদেশ থেকে সম্প্রসারণবাদীরা, উপনিবেশবাদীরা বাংলাদেশকে আক্রমণ করে দখল করেছিল এবং তারা বাংলাদেশকে উপনিবেশ বানিয়ে বাংলাদেশের সম্পদ হরণ করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

আজকে কলকাতা শহর, এই শহর নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে, আজকে যে ইসলামাবাদ, করাচী দেখেন এগুলোও নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের টাকায় এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের শহর তাদের উন্নয়ন তাদের শিল্প এগুলো হয়েছে বাংলাদেশের সম্পদ দিয়ে, বাংলাদেশের মানুষদের তারা বিভক্ত করে রেখেছিল। বাংলাদেশের মানুষের উপর অন্যায়-অত্যাচার করে তাদের শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের এক শ্রেণির রাজনৈতিক দল এখনও তাদের শিক্ষা পান নাই। তারা আজ যেমন আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ), জামাত ইত্যাদি ইত্যাদি যারা বিদেশী অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে বিশ্বাস করে না।

আওয়ামী লীগ তারাতো বাংলাদেশে স্বাধীনতা চায় নাই, তাদের কিছু কর্মী কিছু অল্পবয়স্ক নেতারা স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিল, তাদের নেতৃবর্গরা আমাদের স্বাধীনতাকে বিরোধিতা করেছিল। তাদের এখনও শিক্ষা হয় নাই। এই যে সব দল রয়েছে এরা বিদেশী টাকায় পরিচালিত হচ্ছে। আপনারা জানেন কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আমাদের অন্যান্য কর্মস্থলে বিদেশী টাকায় বিদেশী অনুপ্রেরণায় একদল লোক চাকরিগতভাবে সেইসব দেশের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে কমিউনিস্ট পার্টির যে থিউরী রয়েছে আজ আপনারা দেখছেন তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিজমের মধ্যে ভাঙন ধরে যাচ্ছে। তার উদাহরণ হলো রাশিয়া এবং চায়নার মধ্যে নীতিগত কারণে দর্শনগত কারণে ঝগড়া বিবাদ, কর্মসূচিগতভাবে ঝগড়া বিবাদ।

পোল্যান্ড এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে দর্শনগত এবং নীতিগতভাবে ঝগড়া বিবাদ। আজ বিজ্ঞানের যুগে দুনিয়া এত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে যে অতীতে সেই প্রায় দেড়শ বছর আগেকার মার্কসবাদ ইত্যাদি সেগুলোর নীতিগুলো আর খাটছে না। যার ফলে সেই সব দেশগুলোর লোকেরা দেখতে পাচ্ছে তাদের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদের শক্তি রয়েছে সেগুলো কাজে লাগানো হচ্ছে না এবং তাদের যেভাবে উন্নয়ন সাধন করা উচিত ছিল সেভাবে উন্নয়ন সাধন করতে পাচ্ছে না। আজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কমিউনিস্ট এবং সোশিয়ালিস্ট দেশগুলো যেগুলো তাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ অথবা বড় দেশগুলো রয়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম, সোশিয়ালিজম, অথবা আন্তর্জাতিকতার আওতায় যেগুলো ছোট দেশ রয়েছে সেগুলোকে ধ্বংস করছে এবং সেই সব দেশগুলোর জনগণ এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ।

www.nagorikpathagar.org

যার প্রমাণ পোল্যান্ড। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গেলে আপনারা এগুলো নিজের চোখে দেখতে পাবেন। আজকে কেবলমাত্র আমরা নয়, তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ করে ছোট দেশগুলো হুমকির সম্মুখীন, বিপদের সম্মুখীন।

এখন এখানে অনেকেই বলেন যে, বিশ্ব আজকে দর্শনগতভাবে ক্রাইসিস হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলছি হয় নাই, ক্রাইসিস হয় নাই দর্শন ঠিকই আছে। কিন্তু দর্শনগুলোর এপ্লিকেশন এবং দর্শনগুলোকে যেভাবে বুঝানো হয়েছে সেগুলো বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সেই আগের ভাবধারায় ব্যবহার করলে যে ফল আমরা চাই যে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রয়োজন সেখানে পৌঁছাতে পারা যাবে না। আমরা সমাজতন্ত্র করছি, ধ্বংসের সমাজতন্ত্র নয়, আমরা ন্যায়নীতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্র করছি। এখন বিজ্ঞান খুব দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে।

যার ফলে লিডারশীপ এবং তাদের থিউরী পিছনে পড়ে যাচ্ছে। মানুষ চিন্তা ধারার দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেজন্য আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে এবং রাশিয়ার ব্রেজনেভ সে নিজে বলেছে এই দশকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো খুব অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হবে। এটা আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়ই এবং তাদেরকে এটা স্বীকার করতে হচ্ছে।

তাদের যে কনসেপটেড এপ্লিকেশন এটা আর এগুতে পারছে না। ঐসব দেশ সবই বানাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। আজকে সেই সব দেশে যারা টপ লিডারশীপে রয়েছে, তারা কী অবস্থায় থাকেন এবং সবচেয়ে নিচে যে লোকটা রয়েছে সে কী অবস্থায় থাকে সেটা দেখেন। আমি কোনো দেশের বিরুদ্ধে বলছি না, কিন্তু এগুলোতো আমাদের সমালোচনা করতে হবে। আমরা এগুলোর খপ্পরে পড়তে চাই না। একটা সমতাভিত্তিক রাজনীতি এবং অর্থনীতি আমরা সৃষ্টি করছি যেটা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যেটা দিয়ে আমাদের চরম লক্ষ্য অর্থাৎ শোষণমুক্ত সমাজ, সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো। কাজটা কিন্তু যতটা সহজ বলা ততটা সহজ নয়। এখন এই যে আমাদের চটি বইটা রয়েছে (পকেট বই) এতে যদি পার্টির আদর্শ প্রথম অধ্যায় পড়েন এখানে কয়েক পাতার মধ্যে সবকিছু লেখা রয়েছে।

আমাদের ইতিহাসটা কী ছিল? আমাদের ইতিহাস ছিল কলোনীয়ালিজমের ইতিহাস, জমিদারীর ইতিহাস, এই জমিদাররা কোথায় থাকত, তারা কী করেছে? আমাদের দেশের টাকা দিয়ে তারা কলকাতা শহর বানিয়েছে। এইখানের মানুষকে শোষণ করেছে, সেইখানে নিয়ে গেছে। সেটাই হলো কলকাতার ইতিহাস। করাচী ইসলামাবাদের যে সব সড়ক

www.nagorikpathagar.org

বিল্ডিং দেখেন, বড় বড় ইমারত দেখেন এর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের রক্তের গন্ধ পাওয়া যাবে। এইসব ইতিহাস আপনারা জানেন না। তাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করেন। লক্ষ্য যদি আমাদের সকলের এক হয় তাহলে কোনো ঝগড়া বিবাদ হবার কথা নয়।

আমাদের দেশ আমরা স্বাধীন করেছি যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালে, যে যুদ্ধ হলো জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের দেশ স্বাধীন হলো। কেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? কারণ এদেশের মানুষেরা শোষিত হয়েছে, এই উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার লোকজন দ্বারা; তাই বাংলাদেশের মানুষ বুঝে নিয়েছে যে, আমাদের বন্ধু আর কোথাও নেই। কেউ যদি এদেশের মাটিতে আসে কেউ যদি এদেশের মানুষের একটু সাহায্য করতে আসে, সেটাতে মতলব আছে এবং আপনারা দেখেছেন ১৯৭১ সালে আমাদের দেশের কী ছিল। আমরা কতকগুলো মাড়োয়ারীর হাতে গোলাম হতে চলেছিলাম, আমাদের দেশের সীমান্ত খুলে দিয়ে দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছিল তাদের মামা-চাচাদের কাছে; এর পরেও যদি আপনারা না বুঝতে পারেন, আপনাদের চোখের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেও বুঝতে পারবেন না।

এখন আপনাদেরকে বুঝতে হবে, আপনারা হলেন ভবিষ্যৎ। খালি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নয়, বাংলাদেশের। এই রাজনীতি কেবলমাত্র কানের মধ্যে দিয়ে শুনলে চলবে না, এই রাজনীতি বুঝতে হবে কেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে আজকে আমরা এই যে রাজনৈতিক ক্লাস করছি। এর উদ্দেশ্য হলো আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই যারা আজ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ করেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল করেন তারা বুঝে উঠেন নাই, তারা হুজুগে এসেছেন মেতেছেন। এই রাজনীতি এই দর্শন বুঝতে পারলে আপনারা সব সোজা রাস্তায় চলে আসবেন এবং যেসব ছাত্ররা আমাদের দলে যোগদান করে নাই তারা সব চলে আসবে। আপনাদের মধ্যে কিছু রয়েছেন যারা অন্যকে আসতে নিতে চান না, মনে করেন তাদের নেতৃত্ব থাকবে না। নেতৃত্ব আমি জোর করে ধরে রাখতে পারি; আমি যদি নাও থাকি পার্টি চলবে, দেশ চলবে, আমার নেতৃত্ব আমি জোর করে ধরে রাখতে পারব না। আমার মধ্যে যদি সততা না থাকে, আমি যদি উপযুক্ত এবং যোগ্য না হই, নেতৃত্ব পকেটের মধ্যে রেখে বোতাম বন্ধ করে রাখা যায় না। আমরা চাই যে দলে সর্বত্র যোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব আসুক তার জন্য পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে কিন্তু গুণ্ডামি পাণ্ডামি করলে নেতৃত্ব থাকে না। আমরা সেই নেতৃত্বের মধ্যে নাই। আমরা সেই রাজনীতি করতে চাই না।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের বিপদ কী? আমাদের হুমকি কী, আমাদের বিরুদ্ধে কী রয়েছে? এইটা বুঝতে হবে। আমরা কেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল করলাম, যে জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে স্বাধীনতা যুদ্ধ হলো কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদ শেষ হয়ে যায় নাই। জাতীয়তাবাদের শিকড় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই জাতীয়তাবাদকে মজবুত করতে হবে এবং জাতীয়তাবাদের যে চরম লক্ষ্য রয়েছে সেটা আমাদেরকে হাসিল করতে হবে। আমাদের বিপদ হলো : (১) সম্প্রসারণবাদ, (২) সাম্রাজ্যবাদ, (৩) নয়া উপনিবেশবাদ, (৪) সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদ।

আজ আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্নভাবে শিকারে পরিণত হতে পারি। অতীতে হয়েছিলাম কারণ আমাদের মধ্যে দেশে জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণা ছিল না। তাই যে এসেছে বাংলাদেশের মাটিতে আমাদেরকে শিকারে পরিণত করছে, আমাদেরকে ধ্বংস করেছে, শোষণ করেছে, শাসন করেছে। যদি আমরা সম্প্রসারণবাদের শিকার না হতে চাই তাহলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এই দর্শন, এই আদর্শ এর কর্মসূচি আমাদেরকে সম্প্রসারণবাদের কাছ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

সম্প্রসারণবাদ : আপনারা লক্ষ্য করেছেন বিশ্বে যেসব বৃহৎ দেশগুলো আছে, ইন্টারন্যাশনালিজমের নামে তারা আশে পাশের ছোট দেশগুলোকে কাবু করবার চেষ্টা করছে, বিভিন্নভাবে ভাওতাবাজি করে। আজ আওয়ামী লীগাররা সেই সম্প্রসারণবাদের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং এমনভাবে শিকারে পরিণত হয়েছে, সেই সম্প্রসারণবাদ যে তাদের প্রভু রয়েছে তারা তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করেছে। তাদের কিনে একেবারে সীল করে দিয়েছে এবং তাদের হুকুম ছাড়া এরা কিছুই করতে পারবে না। তাই আজ আওয়ামী লীগকে তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য বিদেশে যেতে হয়। হুকুম আনতে বিদেশে যেতে হয়। কে নেতা হবে, কে হবে না তার নির্দেশ আসে বিদেশ থেকে অর্থাৎ তাদের আস্থা জনগণের উপর নাই, সেজন্য বিদেশ থেকে তাদের হুকুম আনতে হয়, বিদেশ থেকে নির্দেশনামা নিতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশভিত্তিক পার্টি নয় এবং তাদের মধ্যে দিয়ে বিদেশীরা আমাদের দেশে সম্প্রসারণবাদ কায়েম করতে চায়, তেমনিভাবে মনি সিং, আই ডি এল ইত্যাদি।

সাম্রাজ্যবাদ : সম্প্রসারণবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ এই দুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদ ইমেপেরিয়ালিজম, আগে যেসব ইমপেরিয়ালিম ছিল আজকে সেইভাবে সেই সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করতে পারে না। আজকে বিভিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করা হয় আন্তর্জাতিক

www.nagorikpathagar.org

ভাওতাবাজী করে, অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে, রাজনৈতিক একতার নামে এবং বিভিন্নভাবে হুমকি দেখিয়ে। আজ আমরা যদি জাগ্রত না থাকি, আমরা যদি সারা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করি তাহলে অচিরেই আমরা সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদের স্বীকার হব আবার।

নয়া-উপনিবেশবাদ : আজ আগেকার মতো উপনিবেশবাদ করা যায় না। আজ তৃতীয় বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলো সব জেগে উঠেছে। আজ অন্যভাবে উপনিবেশবাদ করা হয় 'কলোনিয়ালিজম', 'নিউ কলোনিয়ালিজম' এবং এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো আওয়ামী লীগ এক গোষ্ঠী কিংবা কিছুলোক তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তাদেরকে টাকা পয়সার লালসা দেখিয়ে, তাদেরকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে হাত করা হয় এবং তাদেরকে দিয়ে ছোট দেশগুলোর মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে সেই দেশে রাজত্ব কায়েম করা হয় এবং সেই সব দেশের যে স্বার্থ রয়েছে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থ সেগুলো ইনজেক্ট করা হয় এবং যে দেশ উপনিবেশবাদে শিকারে পরিণত হয় তাদের অর্থনীতিকে একেবারে পূর্ণভাবে শোষণ করা হয়।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন ১৯৭১ সালের পরে কীভাবে আমরা নয়া উপনিবেশবাদের শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। দুনিয়ার যত বাজে বাজে জিনিস আমাদের এখানে পাঠানো হতো এবং দাম ঠিকই নেওয়া হতো। রাজনৈতিকভাবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত না, সেই চরম অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ : যেহেতু আগের মতো সৈন্য পাঠিয়ে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ কায়েম করতে পারে না, সেইজন্য তারা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে অনুপ্রবেশ করে এবং বিভিন্নভাবে ছলে বলে তাদের দেশীয়, তাদের প্রভাবশালী সাংস্কৃতিকে সেই দেশের মধ্যে বিস্তার করে, যেমন–উদীচী, ছায়ানট ইত্যাদি এইগুলো ঐ ধরনের সাংস্কৃতিক সংগঠন। এদের অনুপ্রেরণাও দেশের বাইরে থেকে আসে, এদের টাকা-পয়সা ভাবনা ও চিন্তাধারা বিদেশ থেকে আসে। আপনারা দেখবেন এরা যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে এটা অন্যভাবে করে, কিন্তু বাংলাদেশতো স্বাধীন হয়েছে যুদ্ধ করে। এই উপমহাদেশে অন্য কোনো দেশ এইভাবে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করে নাই। আমাদের সাংস্কৃতির মধ্যে থাকবে একটা বিরাট একটিভিটি, একটা মুভমেন্ট, যেটা তারা হতে দিচ্ছে না।

তারা জানে যে, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব যদি আমাদের জাতীয় জীবনে আসে কেউ আমাদের গায়ে হাত লাগাতে পারবে না। এই যে

www.nagorikpathagar.org

বাকশালীরা, জে এস ডি এবং অন্যান্য কয়েকটি দল যেগুলো এক ব্যক্তি সর্বস্ব অথবা পকেট দল এরা এই যে হৈচৈ তুললো, তারা প্রতিবাদ সভা করছে, যে আমাদের স্বাধীনতা দিবসকে কেন জাতীয় দিবস করা হলো। সেখানেইতো তারা মার খেয়ে গেল। তারা আমাদের স্বাধীনতা দিবসকে কোনো দিন উপরে উঠতে দিতে চায় না। কিন্তু একটা জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা একবার আসে তাই স্বাধীনতার চেয়ে বড় আর কোনো দিবস হতে পারে না। একটি জাতির, একটি দেশের অনেকগুলো দিবস থাকে, বড় বড় দিবস থাকে কিন্তু তার মধ্যে একটি হয় সবচেয়ে বড়। সেটাকে জাতির দিবস বলা যেতে পারে। সব দেশেরই এরকম হয়েছে এবং আমাদের দেশের জন্য স্বাধীনতা দিবসের চেয়ে আর কোনো দিবস বড় হতে পারে না।

সেই জন্য সেটাকে "জাতীয় দিবস" নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সীমান্তের বাইরে থেকে এই সম্বন্ধে নির্দেশ আসলো যে, এটাকে প্রতিবাদ করো কিন্তু পারল না। জনগণ ঠিকই জানে। স্বাধীনতার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। দুনিয়া জানে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন গত ২৬ শে মার্চ প্যারেডে বিশ্ববিখ্যাত দুইজন ব্যক্তি ইয়াসির আরাফাত এবং আহমেদ সেকুতুরে তারা নিজেরা এসেছেন আমাদের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। তাহলে দেখেন তারা ঠিকই বুঝে জাতীয় দিবসের অর্থ কী, স্বাধীনতা দিবসের অর্থ কী? সাম্রাজ্যবাদীরা, সম্প্রসারণবাদীরা, নয়া-উপনিবেশবাদীরা এবং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে যাতে আমরা সর্বভাবে শক্তিশালী না হতে পারি। আমরা যদি শক্তিশালী হই, আমরা যদি উন্নয়নশীল হই, প্রগতিশীল হই, তবে সেই সম্প্রসারণবাদীরা, সাম্রাজ্যবাদীরা নয়া-উপনিবেশবাদীরা তারা কীভাবে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করবে, তাই তারা চায় বাংলাদেশ দুর্বল হোক এবং বাংলাদেশকে পরিচালিত করুক সেইসব দল এবং লোকেরা যারা দুর্বল এবং যাদেরকে সহজে কাবু করা যায়। আমাদের বিপদ হলো এগুলো, এইগুলোর বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে এবং এইগুলোকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কর্মসূচি গড়ে তুলতে হবে জনগণের সাহায্যে। আমাদের টার্গেট কি? আমাদের টার্গেট বাকশালীরা নয়।

আমাদের টার্গেট হলো জনগণ, তাদেরকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তৈরি করতে হবে এবং তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এইটা করলে বাকশাল বলেন আর যাই বলেন এগুলো সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমাদেরকে আমাদের রাজনৈতিক দর্শন জনগণের

www.nagorikpathagar.org

কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং আপনাদের বিশেষ করে ছাত্র মহলে নিয়ে যেতে হবে। যেভাবে আমি আজকে আপনাদেরকে বলছি, আপনাদেরকেও সেভাবে বক্তৃতা করতে হবে। শুধু কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির নাম শুনে কিংবা পার্টির নাম করে মানুষ আসে না। বক্তব্য ঠিক রাখতে হয়, পার্টি শক্তিশালী হয় কিন্তু সেটা তখনই সম্ভবপর যখন দর্শন ঠিক রয়েছে। যারা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে থাকবেন তারা জেনে শুনে আসবেন, বিশ্বাস করে আসবেন এবং সেই কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করবার জন্য আসবেন।

বিভিন্নভিত্তিক জাতীয়তাবাদ : আপনারা বিশ্বের ইতিহাস থেকে জানেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস থেকে জানেন যে, হিটলার জার্মান জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সে দেশকে একটি কর্মসূচি দিয়েছিল সেটি ছিল রেসিয়াল। রেসকে ভিত্তি করে সে জাতীয়তাবাদ দিয়েছিল, আপনারা এটাও লক্ষ্য করেছেন এবং আরব ন্যাশনালিজমের কথা শুনেছেন আরব রেসকে কেন্দ্র করে। জাতীয়তাবাদ রেসকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ গোষ্ঠীর বলা যেতে পারে, কিন্তু গোষ্ঠীও ঠিক হয় না, বাংলায় আমরা এখনও ঠিক এর অনুবাদ পাইনি ইংরেজিতে রেসিয়াল শব্দটা অর্থবহ।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ : যেটা আওয়ামী লীগ-বাকশালপন্থীরা অন্যান্যরা এবং মনি সিং'রা বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলে, যারা বাংলা ভাষা বলে। কিন্তু পরশুদিন এখানে আমি রাজনৈতিক ক্লাস নিয়েছিলাম। আমাদের যুব অঙ্গদলের পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকজন ছেলে ছিল–আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস কর কিনা? তারা বলল না। বললাম তুমি কীসে বিশ্বাস করো, কোন জাতীয়তাবাদে?

তারা বলল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে। এবং এই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আওয়ামী লীগ শিক্ষা নিয়েছে সেই কলকাতা জমিদারের দ্বারা, যারা দেড়শ বছর বাংলাদেশের মানুষকে হেস্তনেস্ত করে গেছে। এই যে আওয়ামী লীগের যারা নেতা আছেন ১৯৭১ সালের আগে; তাদের কী ছিল, যার বাড়ি ছিল না তার বাড়ি হয়েছে। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ করেছে, সেগুলোকেও আমরা হাতে কড়া দিচ্ছি কিছুদিনের মধ্যে। আওয়ামী লীগের লোকেরা তারা ব্ল্যাকমেইল হয়ে গেছে। তাদের দেশের জন্য আর কিছু করবার ক্ষমতা নাই। তাদের ক্ষমতায় আসবার জন্যে তারা দেশকে বিক্রি করতেও প্রস্তুত রয়েছে। তাদের স্বাধীনতার জন্য কোনো কর্মসূচি ছিল না ১৯৭১ সালে। দেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে কিন্তু তারা পালিয়ে গিয়ে আরাম আয়েশ করেছে এবং তাদের ইতিহাস খুঁজে দেখেন কে কী

www.nagorikpathagar.org

করল, পাবেন। গণতন্ত্র তারা মুখে বলে কিন্তু মনের মধ্যে গণতন্ত্র নাই। কিন্তু মনে রাখবেন এরা '৭৫ সালের পর থেকে যা করেছে, অস্ত্রের ভাষা ছাড়াতো কথা বলেনি, গণতন্ত্রের ভাষায় তো কথা বলেনি, তারা স্বৈরাচারের ভাষায় কথা বলেছে। কিন্তু তারা কিছু করতে পারেনি। কিছুই করতে পারবেও না। বাংলাদেশের মানুষের গায়ে হাত লাগাতে পারবে না আজকে কেউ। সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে।

এখন আমাদের দর্শনটা বুঝে উঠতে হবে সম্পূর্ণভাবে। আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, কলেজে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছেলে মেয়েরা আমাদের দলে আসেনি তাদেরকে টেনে আনতে হবে। আমাদের নেতৃবর্গের কারো গুণ্ডামী পাণ্ডামী দিয়ে কেউ আসবে না, দর্শনের ভিত্তিতে আসবে। এই যে রাজনৈতিক ক্লাসের কারণে আমাদের মধ্যে যাদের একটু গুণ্ডা পাণ্ডার মতো কালারিং আছে তারা যদি সেই কালারিংকে ধুয়ে না ফেলে তারা দল থেকে এবং রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়বে।

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ : আমাদের দেশে যে দলগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করছে সেগুলো হলো মুসলিম লীগ, আই ডি এল. জামাত। তারা বিভিন্নভাবে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ করে কেবল মাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'লা ইয়স্তারুনা, বে আইয়াতে আল্লাহ তামানান কালিলান।' এর অর্থ হলো, যে কোনই মূল্যে হোক না কেন আল্লাহ তায়ালার নামকে বিক্রি করছে এটা সফলতা অর্জন করতে পারে না।

পাকিস্তান চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। তাই যেখানে বিফলতা এসেছে। বিফলতাকে কখনও ইমফোস করতে নাই। আজকে আওয়ামী লীগ যেটা করছে বিফলতাকে ইমফোস করছে। তারা শেখ সাহেবের ইমেজকে বিক্রি করে রাজনীতি করবার চেষ্টা করেছিল পারেনি। আজকে সেটা আরো দুর্বলভাবে ইমফোস করছে। কিন্তু আমরাতো খোলা গণতন্ত্র করছি, করতে দিতে হবে। আমাদের রাজনীতিকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, জাতীয়তাবাদের দর্শনকে। মানুষের কাছে যেতে হবে, আমাদের মধ্যে অনেকে আবার পকেট রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে। তাদের পিঠের মধ্যে বাড়ি দিয়ে মাঠের মধ্যে আমরা ফেলে দিব।

অঞ্চল : আমাদের জন্য প্রযোজ্য ভৌগোলিক এলাকা। বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকা দিয়ে আমরা জাতীয়তাবাদের চেতনা এনেছি জনগণের মধ্যে। আমরা সেইভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছি এবং বড় ভাবে বলা যেতে পারে, আজ এশিয়ান দেশগুলো এরকমভাবে আঞ্চলিক

www.nagorikpathagar.org

একটা জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করবার হয় তো চেষ্টা করছে। এটা এখনও ঠিকভাবে ফুটে উঠেনি বলা যেতে পারে।

অর্থনীতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ : ইইসি'র অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ তারা অর্থনীতিভিত্তিক একটা জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলেছে এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যেখানে তারা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট পর্যন্ত সংগঠিত করেছে এবং সংস্কৃতিও রয়েছে। সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা যায়। এটা অংশ কেবল মাত্র। আমরা বলছি, বাংলাদেশের মানুষকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের দেশীয় জনগণ ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই এবং যুদ্ধ সংগ্রামভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, সেই স্বাধীনতার যুদ্ধ সংগ্রাম-এর মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং সেই সময় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এবং জাতীয়তাবাদ পূর্ণভাবে বিকশিত হলো। যে জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে জনগণ ১৯৭৫ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করল আওয়ামী লীগের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

জাতীয়তাবাদ অনেকগুলো ফ্যাক্টরকে ভিত্তি করে আলাদা আলাদাভাবে অথবা দুই একটিকে সংযোগ করে হতে পারে যেমন রেসিয়াল, ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং যুদ্ধ এই সবগুলো যখন একসাথে মিলিত হবে তখন বলা যেতে পারে সার্বিকভাবে সার্বিকভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হলো সার্বিকভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। আমাদের মধ্যে রয়েছে রেস, ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, অর্থনীতি, আমাদের জন্য আমাদের দেশে রয়েছে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার। এই উপমহাদেশে আর কারো নাই। দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশে গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি নাই। আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে এই ৭টি ফ্যাক্টরের মধ্যে যদি কেবলমাত্র আমাদের রেসভিত্তিক হতো আমরা পারতাম না। কেবলমাত্র ভাষাভিত্তিক হলে তাও পারবেন না। কারণ পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক ছিল বলেই সেটা টিকে থাকেনি। আমাদের জাতীয়তাবাদ সর্বভিত্তিক সার্বিক সেইজন্য আমাদের কোথায়ও যদি দুর্বলতা থাকে অন্য ফ্যাক্টরগুলো সেগুলো পূরণ করবে কিন্তু আমাদের কোনটির মধ্যে দুর্বলতা নেই। আমরা বাংলাদেশী রেস হিসাবে, আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা, আমাদের দেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে। আমাদের ভৌগোলিক অঞ্চল রয়েছে, আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে।

আমাদের সংস্কৃতি রয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার পিছনে আমাদের জাতীয়তাবাদের পেছনে রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

কেন, এ যুদ্ধ আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। মুক্তি এনে দেয়নি। আমাদের জানা আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ফ্রান্সকে দখল করেছিল এবং ১৯৪৪ সালে যখন জার্মান হেরে গেল তখন ফ্রান্স মুক্তি পেল। ফ্রান্সের জন্য সেটা লিবারেশন ওয়ার ছিল। ফ্রান্সের জন্য সেটা স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল না। তেমনি ১৯৭১ সালে এটা আমাদের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল। ভবিষ্যতে যদি কোনো দেশ আমাদেরকে আক্রমণ করে কব্জা করে ফেলে এবং আমরা যুদ্ধ করে আমাদের মুক্তি অর্জন করি তবে সেটাকে মুক্তিযুদ্ধ বলা যেতে পারে। যেখানে আওয়ামী লীগের লোকেরা স্বাধীনতাই চায়নি তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্মই কী বুঝবে আর মুক্তিযুদ্ধই বা কী বুঝবে।

আমাদের রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দর্শনের চরম লক্ষ্য কী? চরম লক্ষ্য হলো একটি ন্যায়ভিত্তিক শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। এই চরম লক্ষ্য সময় মতো যদি এডজাস্টমেন্ট না করা হয়, রদবদল না করা হয় তবে আমাদের অসুবিধা রয়েছে। এর একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আমাদের যেকোনো একটা বিষয়ে দেখেন। আমরা যখন পার্টির সংগঠন গ্রামে নিয়ে যেতে শুরু করলাম তখন আমাদের সংগঠনের বিষয় চরম লক্ষ্য কী ছিল, প্রত্যেক গ্রামে আমাদের পার্টির কমিটি থাকতে হবে। মূল দলের কিছু যখন এডভান্স করে গেলাম আমরা তখন বললাম না, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে আমাদের মূল দলের কমিটিতো থাকবেই কিন্তু তার সাথে যুব অঙ্গদল, মহিলা অঙ্গদল এবং কৃষক অঙ্গদলের কমিটি থাকতে হবে। এবং তার সাথে ছাত্র অঙ্গদল সম্বন্ধে আমরা বলি যেখানে কলেজ আছে, যেখানে ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে আমাদের ছাত্র অঙ্গদল থাকতে হবে।

তা হলে দেখবেন সংগঠনের ব্যাপারেও আমাদের চরম লক্ষ্য সময়ের মতো রদবদল হচ্ছে। আপনারা যেমন বয়সে বড় হচ্ছেন আপনাদের চাহিদাও রদবদল হয়ে যাচ্ছে। তেমনিভাবে আমাদের যে রাজনৈতিক চরম লক্ষ্য যেমনি এডজাস্টমেন্ট হবে সেখানে বসে থাকলে তা আমরা স্টেগনেন্ট হয়ে যাব। আমাদেরকে টার্গেট রদবদল করতে হবে যাতে আরো এক্টিভিটি ক্রিয়েট হয়। সেটাই হলো প্রগতিশীলতা। যেটা বিফল হয়ে যাবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আমরা কি বিফল হয়েছি? দুইটি উত্তর হতে পরে, আমরা সফল হয়ে গেছি কিংবা হইনি। এর মানে এই না যে আমরা সফল হয়ে গেছি।

বিফল হয়েছি কিংবা হইনি। যদি প্রশ্ন হয়–বিফল হয় নি–তার মানে এটা না যে আমরা সফল হয়ে গেছি। যদি বলেন সফল হয়ে গেছি তা হলেতো চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি কিন্তু যেহেতু চরম লক্ষ্যে কোনো দিন পৌঁছুতে পারবেন না সেই জন্য ১০০% কেউ কোনো দিন চরম লক্ষ্যে

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছায়নি। যত বড়ই বৈজ্ঞানিক, যত বড়ই সাহিত্যিক, যত বড়ই কবি বা যত বড়ই নেতা হোক মারা যাওয়ার সময় সে দুঃখ পেয়েই মারা গেছেন। কারণ তার স্বপ্ন এত বড় ছিল যে, সে স্বপ্নটা যে বাস্তবায়িত করতে পারেনি।

স্বপ্ন যে মুহূর্তে পূর্ণ করে ফেলবেন যে কোন মানুষ, তখন তার বাঁচবার কোনো আগ্রহ থাকে না তখনতো কোনো কাজ থাকবে না। তাহলে কী হবে যদি আমরা বিফল হই তা হলেতো এখানে আমরা বসে থাকতাম না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গত আড়াই বছর হলো আমরা দেশ চালাচ্ছি। আমরা গণতন্ত্র দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছি, বহু দলীয় গণতন্ত্র।

দেশে প্রায় ৬০/৭০ পার্টি রয়েছে। দেশে যেখানে ৪টি মাত্র সংবাদপত্র ছিল, সেখানে এখন ৪০০'র উপরে হয়ে গেছে।

যা আমাদের নিজেদের অবস্থা আগের চেয়ে পরিবর্তন এসেছে, আগের তুলনায় সবদিকই অনেক উন্নতি হচ্ছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, খাদ্য উৎপাদন অনেক বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু লোক সংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে না। আমরা অগ্রসর হয়ে গেছি কিন্তু জনসংখ্যার জন্য সেটা ততটা বুঝা যায় না। আমরা যত বেশি চাচ্ছি তত বেশি উৎপাদন করতে পারছি না বলেই আমাদের মনের মধ্যে ক্ষুধা থেকে যাচ্ছে। তবে আমরা বিফল হই নি। আমরা লাইনে এসে গেছি, আমরা সামনের দিকে এগুতে শুরু করেছি। আমাদের গতি আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

এখন দেখুন আমাদের দর্শন আমাদের স্বপ্ন, আমাদের দর্শনের মূলে একটা স্বপ্ন রয়েছে। যে মানুষের স্বপ্ন নেই সে মানুষ কোনো দিনই কিছু করতে পারে না। যে পার্টির স্বপ্ন নাই সে পাটি কোনো দর্শন থাকতে পারে না। আমরা কীসের স্বপ্ন দেখেছি। এটা আমি খুব সাদাসিধেভাবে আপনাদেকে বুঝাতে চাই, আবার বেশি মোচড় দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। এখন স্বপ্নটা হলো আমরা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করব।

শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা হলো আমাদের টার্গেট। আমাদের চরম লক্ষ্য আমাদের স্বপ্ন। সেই যে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কেবল বললেই তো হলো না। এটার মধ্যে কী কী টার্মস আমাদের থাকতে হবে। পাঁচটি মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা জনগণের একান্ত প্রয়োজন। কী কী টার্মস– অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষা পাঁচটির মধ্যে এই তিনটি হলো প্রধান। কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজ বুঝতে কেবল এই পাঁচটিই বুঝায় না। শোষণমুক্ত সমাজের কর্মসূচি পন্থা আমাদের বইতে রয়েছে আমাদের বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করতে চাই।

www.nagorikpathagar.org

দেশটা যদি স্বাধীন না থাকল বিপ্লব দিয়ে কী হবে। প্রথমত, কৃষি সংস্কার, দ্বিতীয়ত, শিক্ষা সংস্কার, ধর্ম আইন সংস্কার, শ্রম আইন, জনশক্তি উন্নয়ন, খনিজ উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা যত এগিয়ে যাব আমাদের তত চাহিদা বাড়বে। আমাদের স্বপ্নটা হলো শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা একটা বৈপ্লবিক পন্থায় একটা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে। তার রাস্তা ইতোমধ্যে আমরা দেখিয়েছি। রক্তাক্ত বিপ্লব আমরা চাই না। রক্ত তো একবার দিয়েছি, রক্ত আবার দিতে হবে না। এখন আমরা এই যে স্বপ্ন দেখছি এই স্বপ্নের পিছনে একটা দর্শন আছে। এই দর্শনটা হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে জনগণ, ভাষা, অঞ্চল, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, যুদ্ধ, সার্বিক, অর্থাৎ আমাদের দর্শন হচ্ছে সার্বিক ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অন্যান্যদের থেকে সবাই আমাদের দলে চলে আসবে। কারণ অন্যান্য দলে কোনো দর্শন নেই। যারা ভালো তাদেরকে আমাদের দলে নিতে হবে।

বর্তমানে দুনিয়াটা প্রত্যেক দিন একই থাকে না। দুনিয়াটা অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ফ্যাক্টর এক থাকছে না। সেই জন্য রাজনীতি কীভাবে একই থাকবে। এটা আমাদের দেশ। এটা আমাদের সকলের দেশ। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ইত্যাদি থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। আমাদের মূল দিক ঠিক রাখতে হবে। কিন্তু অন্যান্য যে সমস্ত সাপোটিং এলিমেন্ট আছে এগুলোকে রদবদল করতে হবে সময় এবং অবস্থা বিশেষে। সেই জন্য আমাদের ধর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তোমরা সময় মতো এডজাস্ট করে নিবে।

যে মৌলভী সময় মতো এডজাস্ট করে দিতে পারে না, সে মৌলভী মৌলভী থেকে যাবে। আর কোন উন্নতি হবে না। আমাদেরকে রদবদল করে নিতে হবে সময় বিশেষে। আমরা দেশের সব কিছু তো সমাজকে খুলে দিয়েছি। তার জন্য জায়গায় জায়গায় কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে। কারণ আমাদের সমাজতো এতদিন দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। বাকশালীরা একেবারে হাতুড়ি মেরে সকলকে হাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে একটা জড়তা এসে গিয়েছিল। সেই জন্য জড়তা ভাঙতে হলে খুলে দিতে হবে সকলকে। বৈপ্লবিক কর্মসূচি দিতে হবে মানুষকে সেই জন্য আমরা গ্রামে গ্রামে জাগিয়ে তুলেছি। তোমরা ঘুমিয়ে থেকো না, উঠো জাগো। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করো। আমাদের কতকগুলো শোষিত গোষ্ঠী রয়েছে, কৃষক, মহিলা, আমরা তাদেরকে বলেছি তোমরা বিদ্রোহ করো।

www.nagorikpathagar.org

এই বিদ্রোহের মধ্যে বিপদ আছে। কিন্তু যদি আমরা ঠিক পথে থাকি তাহলে বিপদ থাকবে না। সেই যে শক্তিটা ফেটে বের হবে সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রগতির পথে লাগিয়ে দিতে হবে। সেই হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য। কমিউনিস্ট, সোশ্যালিজম হাত পা বেঁধে কেটে ফেলে দিচ্ছে। যার জন্য তাদের এ অবস্থা। আমরা যদি এখন অন্যদের অবস্থা দেখে না শিখতে পারি অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে না শিখতে পারি আমাদের মতো বোকা লোক দুনিয়াতে আর থাকবে? আমরা যে দু'শ বছর পরাধীন ছিলাম তার জন্য আমাদেরকে দ্রুতগতিতে উন্নতি সাধন করতে হবে। তাই অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের বুঝতে হবে, শিখতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের জন্য তাদের মতো সোশ্যালিজম করার প্রয়োজন নেই। আমাদের জন্য ক্যাপিটালিজম করার প্রয়োজন নেই।

আজকে কোন দেশে কেবল ক্যাপিটালিজম বা সোশ্যালিজম কোন দেশের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। আমাদের একটা সততাভিত্তিক অর্থাৎ সোশিও ইকনমিক প্রোগ্রাম থাকতে হবে। যে প্রোগ্রামকে সময় বিশেষে রদবদল করে দিতে পারব। সেটা প্রগতিশীলভিত্তিক হবে এবং আমাদের দেশকে জনগণ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমাদের সেই প্রোগ্রাম চাই। মাস কয়েক আগে আমি চীন গিয়েছিলাম রাষ্ট্রীয় সফরে। সেখানে এক বড় নেতা আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা স্বনির্ভর গ্রাম সরকারে কী করতেছো, এটা বুঝায়ে দাও।

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম। সে তখন আমাকে বলল এটা ঠিক। এটাতো চীন দেশেও হওয়া উচিত ছিল। আমাদের সমাজে সবচেয়ে অব্যবস্থা হলো সবচেয়ে নিচে যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা সংগঠিত করি নি। কারণ উপনিবেশ, উপনিবেশবাদতার ভিত্তিতে নিচের মানুষগুলোকে সংগঠিত হতে দেওয়া চলবে না। কলোনীয়ালিজম, সম্প্রসারণবাদ যেগুলো রয়েছে এর স্ট্রাটিজি হলো নিচের মানুষগুলোকে সংগঠিত হতে দেওয়া চলবে না। কারণ তারা সংগঠিত হয়ে গেলে তাহলে শোষণ হবে কীভাবে, সেই জন্য যারা আমাদের উপরে শাসন করল দু'শত বছর ধরে তারা গ্রামের মানুষকে সংগঠিত হতে দেয়নি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে, ঠিক সেই জন্য আমরা পার্টিকে নিয়ে গেছি গ্রামে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সংগঠন স্বনির্ভর গ্রাম সরকার সেখানে করেছি।

গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সেখানে আছে। সেখান থেকে দেশের উন্নতি হবে, আমাদের মধ্যে অনেকে কলোনীয়ান টাইপ রয়েছেন, তারা এখানে বড় বড় বাড়িতে থেকে বড় বড় বক্তৃতা দেন, কেউ আসকান সেরওয়ানী আবার

www.nagorikpathagar.org

প্যান্ট কোর্ট পরেন। তারা আপনাদের বিরোধিতা করবে। তারা চায় না সাধারণ মানুষ জেগে উঠুক। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের বিরোধিতা করে যে আওয়ামী লীগ; জে. এস. ডি (জাসদ)-এ দুটোই কিন্তু বিদেশী। জেএসডি'র আমি পুরা ইতিহাস বলছি এটা ইন্ডিয়ান ইনটেলিজেন্সের ক্রিয়েশন। আপনারা জানেন এটা ভালো করে এবং সৃষ্টি করা হয়েছিল শেখ সাহেব যদি তাদের কথা না শুনে তাহলে জেএসডিকে ব্যবহার করা হবে এবং করাও হয়েছিল। এখন সবগুলো বুঝে গেছে এবং সেজন্য জেএসডি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। যারা বুঝে গেছে তারা বলছে এটা দিয়ে জনগণভিত্তিক থাকতে পারব না। অনেকে বের হয়ে গেছে অনেকে আমাদের সাথে আসছে। সমস্ত দেশপ্রেমিক এলিম্যান্টকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে আনতে হবে। আনপ্যাটিওটিক যারা বিদেশীপন্থী রয়েছেন তাদের মাথায় বাড়ি দিয়ে ঠিক করতে হবে রাজনৈতিকভাবে। তা হলে একদিক দিয়ে আমাদের রাজনীতি শক্তিশালী হবে। সম্প্রসারিত করতে হবে আমাদের রাজনীতির একটিভিটি, জনসভায়, পার্টি কর্মী সভায় প্রতিটি অংগদলের খুব জোরদার একটিভিটি চালাতে হবে। এটা সম্বন্ধে আজকে আমি কিছু বলব না।

আজকে আমি কেবল পার্টির দর্শন সম্বন্ধে বলব। সমগ্র স্বাধীনতা; সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাগুলো না থাকলে সমগ্র স্বাধীনতা হবে না। সমগ্র স্বাধীনতা না হলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হবে না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী না হতে পারলে এই যে ৯ কোটি মানুষের মধ্যে লুকায়িত বিরাট শক্তি রয়েছে সে শক্তির বিকাশ হতে পারবে না। সেই শক্তিটাকে ধরে আমরা কাজে লাগিয়ে দিতে চাই। ইতোমধ্যে আমরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি। খাল নদী কাটা তারই একটা অংশ। বিনা পয়সায় লোকে খাল নদী কাটছে, এইটা আগে কোনো দিন হয়নি।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে এটা হচ্ছে। আপনাদের মধ্যে অনেকে খাল নদী কাটতে গেছেন কোনো পয়সা আমরা দিইনি। কিন্তু আপনারা কেটেছেন জাতীয় স্বার্থে পার্টিয়টিজমের ভিত্তিতে, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। আমাদের কাছে পুরুষ মহিলা তফাত নাই সকলেই সমান। সকলকে দেশের প্রগতিশীল কাজে লাগাতে হবে। এখন এই যে সমগ্র স্বাধীনতা করতে হলে বহুদলীয় গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। মানুষগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে তারা বুঝুক যে অন্যান্য দলগুলো যা কিছু করছে, যা বলছে এটা ভুল এবং তাদের বুঝার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে চলে আসুক। পাঁচটি পয়সা বা লাইসেন্স পারমিট দিয়ে আনতে চাই না। সে রকম লোক

www.nagorikpathagar.org

আমরা পার্টিতে চাই না। আমরা জানি কিছু লোক আছে আমাদের পার্টিতে এগুলো থাকবে না, পালিয়ে যাবে; ওগুলোর দরকার নাই।

ওগুলো চলে গেলেই আমাদের পার্টির ভালো হবে। বহুদলীয় গণতন্ত্র থাকতে হবে। এই গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রকারের আমাদের রাজনৈতিক সংগঠন গ্রামে গ্রামে করেছি, ৪০% পর্যন্ত পৌঁছেছে, বাকিগুলো করতে হবে। আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার হয়েছে। গ্রাম প্রতিরক্ষা করতে হবে। আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার হয়েছে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের এক কোটি সদস্য রয়েছে।

আমাদের জাতীয় মহিলা, যুব মহিলা, যুব, শিশু সংস্থা রয়েছে। আরও অনেক সংগঠন করেছি আমরা কাঠামো বানিয়ে ফেলেছি। এখন এই সংগঠনগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। কীসের কাজে, শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কাজে। শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে কায়েম করব শোষণমুক্ত সমাজ। যেখানে বণ্টন ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাকে আপনারা বলেন সুষম বণ্টন। কিন্তু সুষম বণ্টন করতে হলে প্রথমে প্রোডাকশন, উৎপাদন অনেক বাড়িয়ে ফেলতে হবে যাতে আমাদের উৎপাদন বাড়ার ফলে আমরা দিতে পারি।

সেই জন্য ৯ কোটি মানুষ পুরুষ মহিলা সকলকে কাজে লাগাতে হবে। ক্ষেত-খামারে, কলে-কারখানায় এবং সার্ভিসে এক দিকে ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে হবে অন্য দিকে মানুষের উৎপাদন কমিয়ে ফেলতে হবে। আমাদের স্বপ্ন, স্বপ্নের পর দর্শন, দর্শন হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে বাংলাদেশী দর্শনের ভিত্তিতে সমগ্র স্বাধীনতা প্রয়োজন। স্বপ্নের অর্থ শোষণমুক্ত সমাজ। সুষম বণ্টন শোষণমুক্ত সমাজের ৫টি মৌলিক চাহিদা রয়েছে এবং অন্যান্য চাহিদা রয়েছে, বৈপ্লবিক কর্মসূচির মধ্যে যা রয়েছে। স্বপ্ন দর্শন বাস্তবায়িত করতে হলে চাই সমগ্র স্বাধীনতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা, এটা করতে হলে চাই বহুদলীয় গণতন্ত্র।

সকল মানুষের শক্তিকে খুলে দিতে হবে। বিকাশ ঘটাতে হবে। সেটাকে সংগঠিত করতে হবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সর্বপ্রকারের সংগঠন। আমাদের ধর্মে আছে জাতীয়তাবাদ হলো ঈমান। ধর্মের মধ্যে জবরদস্তি নাই। যে ধর্মের মধ্যে জবরদস্তি আছে বুঝতে হবে সেই ধর্মতে শক্তি নাই। যেমন আমরা বলি যে পার্টিকে আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ কারবার করতে হয়, সে পার্টির মধ্যে শক্তি নাই। সেটাকে জনগণ গ্রহণ করবে না।

www.nagorikpathagar.org

তাই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে পালিয়ে লোক মেরে সেই পার্টির শ্রী বৃদ্ধি করতে হয়।

এখন আমাদের হুজুগে পার্টি করা চলবে না। এখন আমাদের পূর্ণভাবে জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে এবং সেইখানে আমাদের পার্টির দর্শন ও কর্মসূচি দিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাই আজ আমরা আপনাদের রাজনৈতিক ক্লাস নিলাম এবং ছাত্রদলের ক্লাস আমি নিজে নিব। প্রথমে মৌলিক জিনিসটা বুঝতে হবে, এগুলো না বুঝলে, আপনারা বুঝাতে পারবেন না পার্টি কেন করছেন। আপনাদেরকে এমনভাবে বুঝাতে হবে। যেসব ছাত্র নিরপেক্ষ রয়েছে কোন দলে যোগদান করেনি, ৯৫% ছাত্র ও ছাত্রী নিরপেক্ষ রয়েছে এখনও কোনো দলে যোগদান করেনি। তাদেরকে নীতিগতভাবে বুঝাতে হবে। তারা এসে যাবে এবং অন্যান্য পার্টির ছাত্র সংগঠন যাদের রয়েছে তাদের কাছে যখন বলবেন তারা যখন বুঝতে পারবে তখন অটোমেটিক্যালি এসে যাবে।

খোদা হাফেজ

সূত্র : পার্টি ক্যাডার প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি : মোশাররফ আহমদ ঠাকুর। লুব্ধক পাবলিশার্স, ১৯৯১

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীন জাতির স্বাধীন উপলব্ধি : প্রশিক্ষণ ক্লাসে জিয়ার আরেকটি ভাষণ

একজন মননশীল আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় যারা রয়েছে নীতিনির্ধারকের ভূমিকায়, তাদের চিন্তার রাজ্যেও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল সুরটিকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক কর্মী, দলীয় নেতৃবৃন্দ, সংসদ সদস্য, মন্ত্রীপরিষদের সদস্য প্রভৃতির প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রে তাঁর দেয়া বক্তৃতামালার একটি হচ্ছে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ। বাংলাদেশের শুধু নয়, বিশ্ব ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলোর খুব একটা হেরফের হয়নি পরবর্তীকালে। মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ ক্লাসে তিনি এই ভাষণটি দেন।

আপনারা বাংলাদেশের ইতিহাস পড়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস গত দুই হাজার বছরের ইতিহাস, যদি না পড়ে থাকেন তাহলে এর সূত্রটা পাবেন না। বাংলা, বঙ্গ। বঙ্গ বুঝতে বর্তমানে যে বাংলাদেশের এলাকা সেটাই বোঝাত। কিন্তু আপনারা যারা ইতিহাস পড়েছেন তারা জানেন। গত দু'হাজার বছরের ইতিহাস পড়তে হবে। বঙ্গ, বাঙ্গালা, বাংলাদেশ। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এই বাঙ্গালা কথাটার উল্লেখ আছে, আরব দেশে আছে, মধ্যপ্রাচ্যে আছে। বাঙ্গাল এমনকি ইন্দোনেশিয়াতেও আমি এই শব্দটি শুনেছি। যখন সূত্র খুঁজবেন তখন বাংলাদেশের সঙ্গে এর সূত্র খুঁজে পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নয়। ওরা অন্য নামে পরিচিত। আমাদের জাতীয় সত্তা আলাদা এবং আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা। আমাদের এখানকার বাংলা ভাষা হলো মূল বাংলা ভাষা।

যেটা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম এবং পূর্বেও গেছে, আসামেও। যদি আসামী কথা শুনেন, আসাম রেডিও কিংবা গৌহাটি রেডিও যখন শুনবেন তখন আপনি অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন। দেখবেন বাংলা ভাষার একটি ভগ্ন রূপ বা খণ্ডিত রূপ। তেমনিভাবে যখন পশ্চিম দিকে যাবেন বাংলা ভাষার রূপ বদলে যেতে থাকবে। বাংলাদেশ হলো বাংলা ভাষা, বাংলাদেশী

www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতি ও কৃষ্টির হেডকোয়ার্টার। এটা বুঝতে হবে। অনেকেই আপনারা বুঝেন না এবং শান্তি নিকেতনের কথা বললে আপনাদের আমাদের মনে-প্রাণে অনেক রকম অনুভূতি হয়। ওখানে যা কিছু নিয়ে গেছে, এখান থেকে নিয়ে সেটাকে আর একটা রূপ দিয়েছে। জিনিসটা বুঝতে হবে। তখন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। আপনি অতীতে চলে যান হাজার বছর তারও বেশি, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় ৯/১০ সেঞ্চুরি থেকে। আমি আগেই বলেছি

রাজনীতিতে ধর্মটা সবচেয়ে বড় কথা নয় কিন্তু ধর্ম একটা কথা হতে পারে। জাতিগতভাবে আমরা ভিন্ন। যেমন আপনারা দেখবেন মোঙ্গলীয় জাতি আছে। তাদের হেড কোয়ার্টার বলা যেতে পারে চীন দেশের যেকোনো একটা মূলবিন্দু থেকে ধরে নিতে পারেন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন দিকে এটা ছড়িয়েছে। যেমন করে দূরে ছড়িয়ে পড়ে জিনিসটা লঘু থেকে লঘু হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এটা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। বার্মাতে যে জাতি দেখা যায় তারা মোঙ্গলয়েড। মোটামুটি তাদের মধ্যে এবং চীনাদের মধ্যে পার্থক্য দেখবেন। আসামে তারা কিন্তু জাতিগতভাবে মোঙ্গলয়েড কিন্তু চীনাদের থেকে পার্থক্য দেখবেন।

যদি আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে মোঙ্গলয়েড সব একসঙ্গে এক কামরার মধ্যে ভরে দেন তাহলে হঠাৎ মনে হবে যে, আরে এরাই তো সব একই লোক। আসলে কিন্তু এক লোক নয়। কেউ বার্মা, কেউ থাইল্যান্ড, কেউ মালয়েশিয়া, কেউ চীনা, কেউ মোঙ্গলীয়, কেউ ভুটান, কেউ নেপাল, কেউ সিকিম, কেউ ভারতের পূর্বপ্রান্ত অর্থাৎ আসাম এলাকার। তেমনিভাবে, কতকটা আমাদেরও অবস্থা। এটাই হল আমাদের জাতি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল অবস্থান। বাংলাদেশ এবং এখান থেকে চারপাশ আমাদেরই মাল-মশলা বিভিন্ন সময় ইতিহাসের বিভিন্ন সময় ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে আমরা বলতে পারি যেকোনো এলাকার ওপর আমাদের দাবি আছে। আমরা হয়তবা এটা বলতে পারব না। কিন্তু তারাও আমাদের ওপর দাবি করতে পারে না। সেই জন্য এপার বাংলা ওপার বাংলা কথাটায় কোনো বাস্তবতা নেই।

১৯৭১ সালে আমি কোন রাজনীতিবিদ ছিলাম না। ১৯৭১ সালে আমরা যে যুদ্ধ করলাম, কোনো ক্ষমতার লোভ করিনি। আমরা টাকা-পয়সার লোভ করিনি। আমি জানি যে আমি যুদ্ধে নেমেছিলাম। আমি পাকিস্তান

www.nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনীতে ছিলাম, ভালোই ছিলাম কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদর চেতনা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ, যার আদর্শ আমি ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলাম। আমি দেখলাম যে বাংলাদেশকে কীভাবে শোষণ করা হচ্ছিল এবং হচ্ছে। সেই সময় ১৯৭১ সালের আগে বর্তমানের বাংলাদেশকে কীভাবে শোষণ করা হয়েছে। কলকাতা কেন্দ্রিক শোষণ, দিল্লি কেন্দ্রিক শোষণ, তার কারণ এই ছিল যে, আমাদের মধ্যে এই ভাবধারার চেতনা সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করতে পারিনি, যে পর্যায়ে এটাকে একটা স্বাধীনতা হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আপনারা যদি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনা আজকের নয়, শ শ বছর আগেকার। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এগুলোর প্রমাণ পাবেন বিভিন্নভাবে এবং এটা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে।

একটা জাতীয় সত্তা গড়ে উঠতে শ শ বছর লাগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা গড়ে উঠেছে শত সহস্র বছর ধরে এবং সেই যুগ জ্যোতির্ময় জিয়া–যুগ ধরে আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন যেটাকে বলা যেতে পারে আমাদের জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে এটা একটা সঠিক রূপ নিয়েছে।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় অবশ্য ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল কিন্তু তার সঙ্গে তারা জুড়ে দিয়েছিল এপার বাংলা ওপার বাংলা। তারপর আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে শাসন চালাবার জন্য তারা অভিজ্ঞ দল পাঠিয়েছিল কয়েকশ। এমন হাবভাব যে, আমরা কিছুই জানি না। কিছুই করতে পারি না এবং তাদের সেই চেষ্টার উল্টো ফল হয়েছে। তার কারণ যদিও বাকশালীরা, তখনকার আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে–বাংলাদেশীরা জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ছিল না। সেখানে তারা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আসল কথা হলো যে আওয়ামী লীগ কেবল মাত্র পাকিস্তানের ক্ষমতার গদিতে বসতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ–ছাত্রগোষ্ঠী তারা স্বাধীনতা চেয়েছিল। নেতারা যারা ছিলেন তারা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে চাইছিলেন না–এটা করতে গিয়ে যদি আমরা ক্ষমতা না পাই।

কারণ আমরা তো অনেক দিন ধরে রাজনীতি করলাম, অনেক কাজ করলাম, আমাদের ক্ষমতায় যেতেই হবে। সেখানে তাদের একটা আত্মসংঘাত লেগে গিয়েছিল। ১৯৭১ সাল আমি যেটা লক্ষ্য করলাম মার্চ

www.nagorikpathagar.org

মাস থেকে আওয়ামী লীগের মধ্যে দুটো ডিভিশন হয়ে গিয়েছিল। যারা যুব সমাজের প্রতিনিধি তারা বলেছিল স্বাধীনতার কথা, বিভিন্নভাবে বলেছিল। অনেকে কিন্তু বুঝত না স্বাধীনতার কথা, কেউ কেউ অটোনমির কথা বলেছে, কেউ স্বাধীনতার কথা। কিন্তু জনগণের মানসিকতা স্বাধীনতার জন্য ছিল। তারা বুঝে ফেলেছিল যে পাকিস্তান দিয়ে আমাদের কিছুই হবে না। আওয়ামী লীগ নেতারা চেয়েছিলেন ক্ষমতার আসন। যার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কী করল? তারা চিন্তা করে দেখল আমাদের এখানে ঝুঁকি নিতে হবে। আমাদের এমন একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে হয় আগামী ১০/২০ বছর বাংলাদেশকে আমরা চালিয়ে যাব গোলামের মতো অথবা যেটাকে আমরা বলি এসপার ওসপার। এদিক-ওদিক এবং সেভাবেই তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং সেখানেই আবার তারা মস্তবড় ভুল করল।

তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে আর কিছু করা যাবে না। এটার সমাধান হল বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া একটা প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে। যেহেতু তারা সব সময় স্বল্প মেয়াদে কাজ করে থাকে সেজন্য তারা এটার দীর্ঘমেয়াদের গুরুত্ব বুঝতে পারল না এবং সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল। আমরা যারা ছিলাম আমরা নিজেদের মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, এভাবে যদি তারা হরতাল করে আমরা হরতাল ভঙ্গ করব এবং সেটা চরম অবস্থায় চলে যাবে এবং চরম অবস্থা মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমরা কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম তার জন্য।

২৫ মার্চের পরে আমাদের তরফ থেকে যে প্রতিক্রিয়া হল এগুলো যদি পরীক্ষামূলকভাবে দেখেন তাহলে এটার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। তারপরে যুদ্ধকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বারবার চেষ্টা হয়েছিল পাকিস্তানীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে ক্ষমতায় আসা এবং ভারতও সেটাই চেয়েছিল। ভারতের চেষ্টাও ছিল অন্ততঃপক্ষে আমি যতদূর জানি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে, পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সমঝোতা করে একটা কনফেডারেশনের মতো করা, যার মধ্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং তাদেরই একজন যিনি আজকে ইসলামকে বগল দাবা করে চলছেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত এর মধ্যে ছিলেন।

এখন আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান আছেন তারা অন্য কারোর চেয়ে কম মুসলমান নন। যারা হিন্দু আছেন তারা অন্য কারোর চেয়ে কম হিন্দু নন। যারা খ্রিস্টান আছেন তারা অন্য কারোর চেয়ে কম খ্রিস্টান নন।

www.nagorikpathagar.org

আমরা সকলেই ধর্মকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। কিন্তু ধর্মকে রাজনৈতিক পুঁজি করলে এটার উল্টো ফল হয়। কারণ ধর্মটা আধ্যাত্মিক, আল্লাহতায়ালার কাছে থেকে এসেছে। রাজনীতিটা জাগতিক বিষয়। এখন তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ একটা ক্ষুদ্র কোণ থেকে দেখলেন। যেটা আপনি করতে চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যেহেতু পাকিস্তান, তার আগে ব্রিটিশ আমাদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করেছে। সেজন্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হয়েছে– এটা ঠিক নয়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে একটা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে। একটা ঘাত-প্রতিঘাত না খেলে রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে ওঠে না। এই যারা আমাদের ঘাত-প্রতিঘাত দিচ্ছে বাকশালীরা এবং অন্যরা এর ফলে আমরা মজবুত হয়ে উঠেছি।

গতকাল আপনারা যে রমনা গ্রীনে মিটিং করলেন, মিটিং কী ছিল? আলোচনা সভা। কত লোক এসেছিল এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ব্যানারে রাত ৪টা পর্যন্ত যে যাত্রা ইত্যাদি চলছে লোকজন কেন থাকল জাতীয়তাবাদের নামে? কারণ তারা এখন একটা জাতীয় সত্তা পেয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকটা মানুষ একটা পরিবার, একটা গোষ্ঠী, একটা সমাজে তারা বসবাস করতে চায়। বাংলাদেশের মানুষকে কেন সে রকম সুযোগ দেয়া হয়নি।

তারা সেই সুযোগ পেয়েছে। এই হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। যেকোনো দেশের প্রত্যেকটি মানুষ গর্ব অনুভব করতে চায় তার দেশকে কেন্দ্র করে, তার জাতিকে কেন্দ্র করে, তার সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে, তার ভাষাকে কেন্দ্র করে, তার অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। তার দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে যেন গর্ব অনুভব করতে পারে। সেটাই সে চায়।

এখন আপনারা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হলো ১৬ ডিসেম্বরে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক কাজ করতে শুরু করল, যেটা পাকিস্তান সেনাবাহিনী করছিল বিভিন্নভাবে এবং আমরা খবর পেতে শুরু করলাম যে তারা এখানে ওখানে লুটপাট করছে, অন্যায় করছে এমনকি মেয়েদের ওপর অত্যাচার তারা শুরু করে দিয়েছিল। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? আমাদের ছেড়ে কেউই কথা বলবে না। কিন্তু আমাদের বাকশালী ভাই সাহেবরা এটা বুঝতে পেরেছেন?

আমাদের ইতিহাস তো বঞ্চনার ইতিহাস। আমাদের ইতিহাস এটা বাকশালীরা কীভাবে ভুলে যায় আমি তো এটা বুঝি না কী ধরনের? এই

www.nagorikpathagar.org

ধরনের রাজনীতি এটার শিকড় থাকতে হবে জনগণের মধ্যে। বাংলাদেশ-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই আদর্শের অনুপ্রেরণা বাইরের দেশগুলো থেকে পাবে না, এর অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু নেতাদের মধ্যে নেই। নেতারা পালিয়ে গেল, জনগণ পালায়নি। যার ফলে সেই নেতারা যখন গদিনসীন হলেন তখন তাদের আদর্শগত ভিত্তি ছিল না। আপনি আগেকার আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র পড়ে দেখবেন, তাদের কোনো জনগণভিত্তিক কর্মসূচি ছিল না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক– সর্বক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য হল পাকিস্তানের রূপরেখার মধ্যে ক্ষমতায় থাকা।

এগুলো সত্য, এগুলো বুঝতে হবে। আমাদের চিন্তাধারা হল জাতীয় ও জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচি গড়ে তোলা। মনে রাখবেন যে রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই রাজনীতি আপনাদের ধাবিত করবে একটি সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির দিকে। সেই রাজনৈতিক আদর্শ আপনাদের ধাবিত না করে তাহলে সেই রাজনৈতিক দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে গেল। আমি যে খালি জাতীয়তাবাদী এটা যথেষ্ট নয়।

আমি যে কেবল মাত্র বুঝলাম বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশের সৃষ্টি হল যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তারপর কী? তার বেশি কিছু না। যেহেতু সেখনে শূন্যতা ছিল সেহেতু তার সমুদ্রে যেমন নৌকা খাবি খেতে খেতে চলে তেমনিভাবে চলছে এবং '৭১-এর পরে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তাদের কোনো বাস্তব কর্মসূচি ছিল না। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পাকিস্তানের রূপরেখার মধ্যে ক্ষমতা দখলের। এখন এগুলো বোঝেন। এখন আমার যেটা মনে হয়, আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ এখনও বিষয়টা বুঝতে পারেনি এবং বুঝতে পারবেও না যারা আওয়ামী লীগের তাদের বয়স সেই সীমা পেরিয়ে গেছে। এখন আর তার নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না। তারা ঐ জিনিস আঘাত করতে করতে ভেঙে যাবে কিন্তু বদলাবে না।

কারণ তাদের মাথার মধ্যে আর কিছুই ঢুকবে না বাকশালী ছাড়া। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে যে বাকশালীইজম পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে। জনগণ তাকে পরিত্যাগ করে দিয়েছে। '৭৫-এ আবার পরিত্যাগ করে দিয়েছে। আমার মনে হয়, '৭৩ সালেই এটা করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে কারণ আওয়ামী লীগ যে নির্বাচন করেছিল যেটা কোন ন্যায় সঙ্গত নির্বাচন ছিল না। তারপরে '৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থা করে দিল– বাকশালইজম–এটার

www.nagorikpathagar.org

জন্য তো জনগণের কাছে যায়নি। তাদের রেফারেন্ডাম করা উচিত ছিল তখনই, যেহেতু তাদের সাহস ছিল না। জনগণের কাছে যাবার। সেই জন্য রাতারাতি ধমকাধমকি করে তারা এটা পাস করে ফেলল।

এটার সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয়নি, যার ফলে '৭৫ সালে এবং তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলো এটাই প্রমাণ করে ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সালের প্রথমদিকে যে দুইটি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং সংসদের নির্বাচন, আমি আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, নির্বাচনগুলোর জন্য তিন বছর থেকে, ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি থেকে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তখন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। ১৯৭৬-৭৭ সালে এর জন্য আমাদের অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। আমরা সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে নির্বাচন যেন একেবারে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয় এবং সেটা হয়েছে। ভুলভ্রান্তি হয়ত এদিক ওদিক হয়েছে সেটা স্বাভাবিক। এত সমস্যাপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পুরোপুরি সঠিকভাবে নির্বাচন দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা পেরেছি তার প্রমাণ হল যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। নির্বাচনের পরে বাকশালী এবং অন্য দলগুলো যেভাবে তারা কাজ করে চলছে, গত আড়াই বছরেরও আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে গেছে। আড়াই বছর পার হয়ে গেল।

তারা কোনো কিছু করতে পারেনি কারণ তাদের রাজনৈতিক দর্শন নাই। এবং তাদের রাজনীতি জনগণ সমর্থন করে না। যদিও আমাদের পার্টি নতুন এবং আমাদের অনেক ভুলভ্রান্তি রয়েছে। আমাদের কী কী ভুলভ্রান্তি রয়েছে তার সম্বন্ধে আর একদিন আমি বক্তব্য রাখব। এখন তাহলে কী হল? একটা জিনিস আপনাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে সেটা হল যখন কথাটা আপনারা ব্যবহার করেন সেটা বাংলা বললে বাংলাদেশী বুঝায়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ বলতে বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ যেটা রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে কিছু নেই। অনেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বোঝাতে সেই জাতীয়তাবাদ বোঝাতে চেষ্টা করেন যে জাতীয়তাবাদ তাদের মধ্যে হল বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম উড়িষ্যা, বিহার।

এটা অকল্পনীয় এবং সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘাড়ের ওপর তিন চারটা কোপ ইতোমধ্যে পড়ে গেছে। আসামে পড়েছে, পশ্চিম বাংলায় পড়েছে। ওদের যে বাঙালি খেদাও আন্দোলন আসামে সেটার মধ্যে দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

কোপ পড়েছে। বিহারে যে বাঙালিদের খেদাও-সেটার ওপর কোপ পড়েছে। উড়িষ্যাতে যে ভারতীয় ও অন্যদের বের করে দিচ্ছে সেটায় পড়েছে। আমরা যদি আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি, সেটাই আমাদের জন্য ভালো হবে। কারণ ভারতে তাদের অনেক সমস্যা আছে, তাদের সমস্যা তাদের মতো করে সমাধান করতে দেন। আমরা আমাদের ঘর গুছাই।

আমাদের ঘর গড়ে তুলি। আর একটা কথা মনে রাখবেন, যেটা আমি আগে বলেছিলাম–বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে আমাদের আন্তর্জাতিক ও ভৌগোলিক সীমা, আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশের যে সীমারেখা রয়েছে সেটাই। আর একটা কথা মনে রাখবেন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিকর্তা জনগণ। এর উত্তরাধিকারীও জনগণ। এটা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয়নি, এর দর্শন কোন ব্যক্তি দেয়নি–জনগণ দিয়েছে এবং এটা গড়ে উঠেছে শত সহস্র বছর ধরে। অনেক সময় আপনারা আমাদের কারো কারো নামে জাতীয়তাবাদকে সংযুক্ত করেন এটা ভুল এবং ভবিষ্যতে এটা করবেন না। যখনই করবেন তখনই আমাদের যে আদর্শ, রাজনৈতিক আদর্শ ব্যাহত হবে। রাজনৈতিক আদর্শ কখনই কোন মানুষকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। অনেক সময় আপনারা আমার নামে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেন তখন আমার খুব খারাপ লাগে। কারণ আমি জানি ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম, সেটা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে।

নিজেকে কেন্দ্র করে তো করিনি। আমি তো জানি, আসলটা তো আমি জানি এবং আমি যদি অন্যভাবে এটাকে রূপ দেই তাহলে সেটা হবে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে ভুল। আমাদের উদ্দেশ্য কী? ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয়তাবোধের প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আমাদের জাতীয় সত্তা হিসেবে একেবার গেড়ে দেয়া। মানুষের-শুধুমাত্র শহরের মানুষের নয়, গ্রামের মানুষ–কারণ বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন মানুষ গ্রামে বাস করে। যেহেতু শহরের মানুষ বেশি শিক্ষিত সে জন্য শহরের মানুষকে বেশি নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অতীতের রাজনীতি শহর কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কিছু মানুষকেন্দ্রিক সেজন্য আমাদের দেশে রাজনীতি সব সময় ভুল পথে চলছে।

আজকে বিরোধী দলগুলো যে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারছে না–তার কারণ আমাদের শিকড় আমরা গেড়ে দিয়েছি গ্রামে।

www.nagorikpathagar.org

শহর তো অবশ্যই আমাদের শক্তি কিন্তু গ্রামের শক্তি ছাড়া শহরে পারবেন না। মনে আছে ১৯৭১ সালে পালিয়ে গিয়েছিলেন গ্রামে। বাংলাদেশ যে সৃষ্টি হল, এটা একটা রাজনৈতিক সমাধান হল একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হয় বিভিন্নভাবে।

অনেক সময় আপনারা দেখেছেন যুদ্ধ ছাড়াই সমাধান হয়ে যায়। যখন সেটা সোজা সমাধান, কিন্তু যখন শক্ত সমাধান তা কেবলমাত্র টেবিলের উপরে হয় না। সে সমাধানটা হল রাজনৈতিকভাবে। একটা সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা একটা যুদ্ধ অনেকগুলো পন্থার একটি পন্থা এবং সেটা হল সবচেয়ে ভয়াবহ পন্থা। যখন অন্যসব পন্থা অকৃতকার্য হয় তখন এই পন্থা চালাতে হয়। আবার বিদেশী চক্রান্ত রয়েছে। আজকে আমাদের প্রতি তাদের থেকে হুমকি রয়েছে। তাহলে আমাদের কী করতে হবে? কয়েক হাজার সেনাবাহিনী থাকলে আমাদের কাজ হবে না। কারণ আমাদের প্রতিরক্ষাটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে। জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিকর্তা জনগণ। জনগণকে রক্ষা করতে হবে।

বীজটা জনগণের মধ্যে থাকতে হবে। সেই জন্য আমরা বলছি এখানে বিপ্লবের এক নম্বরে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আরও বুঝায় বিপ্লবটা হল আমাদের জাতীয়তাকে হাসিল করা বাস্তবমুখীভাবে। বিপ্লব হল আমাদের উপায়। এটা হল আমাদের সোসিও ইকোনমিক-কালচারাল প্রোগ্রাম। প্রথমেই আপনারা দেখবেন অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ। দ্রুততম সময়ে গণমানুষের জন্য নিশ্চিত করাই হবে এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আরও বুঝায় এই পাঁচটা না করলে যতই আপনারা সুন্দর সুন্দর মন্ত্র বলেন কোনো লাভ হবে না। সমস্ত রাজনীতি সমস্ত সংগ্রামী জীবনের উন্নয়নের জন্য এবং জীবন উন্নয়নের পাঁচটি মূল লক্ষ্য হলো অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আরও বুঝায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা। যদি স্বাধীনতাই না থাকে তবে জাতীয়তাবাদ থাকবে কী করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন একটি সুষম পররাষ্ট্রনীতি। একই সঙ্গে আমাদের জতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। ছোট হলেও একটা সদা প্রস্তুত কার্যকর বাহিনী আমাদের থাকতে হবে। আর এই সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে থাকবে আধা সামরিক বাহিনী ও জনগণের মিলিশিয়া। এছাড়া স্কুল-কলেজে ক্যাডেট কোরের মাধ্যমে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রথমে দেশটাকে বাঁচাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

দেশটাকে বাঁচাতে না পারলে, প্রতিরক্ষা না করতে পারলে জাতীয়তাবাদকে ভেঙে চুরমার করে দেবে। কারণ, আমরা লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেছি। দুনিয়াটা এমন–প্রত্যেকে একজন অপরের লক্ষ্যবস্তু এবং দুনিয়াতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন এই যে সমাজতান্ত্রিক ব্লক যেটাকে বলে এটার মধ্যে একটা আজব জিনিস আছে। যদি এসব দেশগুলোতে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে একটা দেশ বাকি সবগুলোকে শোষণ করছে বিভিন্নভাবে। সেজন্য আমরা বলি সারভাইবেল অব-দি-ফিটেস্ট। আমাদের ফিট করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে এবং আপনারা দেখবেন কোনো দেশ যদি সাহায্য করে, এতটুকু সাহায্য করলে বলবে এতটা- আর তার পরিবর্তে আপনার কাছে থেকে নিয়ে যাবে আরো এতটা- যেটা '৭১ সালে হয়েছে। যুদ্ধ করলাম আমরা, বাংলাদেশের মানুষ মরল। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেল তখন অন্য সাহেবরা আসলেন–হয়ে গেল তাদের নামধাম।

কিন্তু সত্যকে তো ঢাকা যায় না। আমরা যদি স্বাধীন না হতে চেতাম তাহলে কে আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারত। আর যদি আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম–কে আটকাতে পারত। যদি কোনো বিদেশী নাও আসত তাহলেও আমরা স্বাধীন করে নিতাম দেশকে। এর মধ্যে আবার একটা মজার ব্যাপার আছে। ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযোদ্ধারা অর্থাৎ যারা সেই সেনাবাহিনীতে হোক, গেরিলা হোক, যারা দেশের মধ্যে যুদ্ধ করছিল তখন আওয়ামী লীগাররা কলকাতায় বসে দেখল যে আরো যদি বেশিদিন যুদ্ধ চলে তাহলে আমাদের হাত থেকে নেতৃত্ব চলে যাবে। তখন তারা তাদের গুরুদেরকে বলল যে, ভাইসাহেব বাঁচাও। এই রকম চলতে থাকলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব হারাব।

ওরা নিজেরাই আমাকে বলেছে, আমাদের একটা সেকশন ছিল। তারা বলেছিল যে, যতটা বিদেশ থেকে সাহায্য পাই ভালো। যুদ্ধ চলুক, দুঃখকষ্ট আরো বেশি হবে। তবে দেশটা-জাতিটা দাঁড়িয়ে যাবে। কারণ আমরা সেনাবাহিনীরা ধরে নিয়েছিলাম যে পাকিস্তান বেশিদিন চালাতে পারবে না এই যুদ্ধ। যেভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠনটা গড়ে উঠেছিল তাতে পাকিস্তানীরা বেশিদিন টেকার কথা ছিল না। স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে তাদের হাতের মধ্যে দিয়ে যেন স্বাধীনতা না আসে সেজন্য একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ এবং বিদেশী কেউ কেউ মিলে। কারণ সকলেই চায় আপনারা দুর্বল থাকেন। বিদেশে

www.nagorikpathagar.org

কেউ চায় না বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল হোক। এরা সকলেই চায় যে বাংলাদেশ খুব গরীব থাক, ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াক, ভিক্ষা করতে হয় কিছু কিছু ভিক্ষা দিয়ে দিবে এবং ভিক্ষা করতে করতে আপনাদের অভ্যাসটা এমন হয়ে গেছে সব বড় বড় মানুষ হয়ে গেছেন।

বড় বড় বাড়ি, গাড়ি হয়ে গেছে। তাও ভিক্ষা না পেলে আপনাদের দিনটা ভালোভাবে কাটে না। এটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সেজন্য আমরা এটাকে রোধ করতে চাই। সাহায্য কম নিয়ে সকলে কাজ করে যান। ভিক্ষা চলবে না এবং আমরা এটাকে রোধ করব। আমি তো আগেই বলেছি এরকমভাবে ভিক্ষা করে আমরা চলতে পারি না। একটা আত্মমর্যাদাপূর্ণ দেশ ও জাতি হিসেবে আমরা থাকতে পারি। সকলকে কাজ করতে হবে। সকলকে কাজ করে খেতে হবে। সেদিন এক মৌলভী সাহেব এসেছিলেন আমাদের কাছে। উনি বললেন, আমরা তো আপনার দল করি। আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছি। সেই জন্য বাধিত আমি। উনি বললেন, আপনার সব কাজ ভালো লাগে কিন্তু একটা কাজ এই যে মহিলাদের বের করেছেন।

উনি আবার ভাবলেন–বলে ঠিক করলাম কি না। আমি বললাম–উত্তরটা দেই। বাংলাদেশের গ্রামে এসব কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে শহরে। শহরের কোনো কোনো এলাকায় যারা বড় বড় গাড়িতে চড়েন, টাকা-পয়সা আছে–সাথে সাথে তাদের মধ্যে মানসিক বিকৃতি এসেছে এটাই খারাপ। আমি তাকে বলেছিলাম মহিলাদের বোরকার মধ্যে রাখলেও যারা গোলমাল করে তারা করবে। যারা করবে না তারা এমনিতেও করবে না। এটা হলো রুচির প্রশ্ন–কে কেমন তার ওপর নির্ভর করে। তা শুনে উনি চুপ, আর কথা না। আর একজন পীর সাহেব বলে পরিচয় দিলেন–উনিও একই কথা বললেন, উনি বললেন, মহিলাদের পুলিশে নিচ্ছেন। আমি বললাম, আজ-কাল মহিলারাও ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। তাদের ধরতে হলে মহিলা পুলিশ থাকতে হবে। বললেন, তাতো ঠিক কথা কিন্তু তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বললাম, তাদের তো বোরকা পরতে দেয়া যায় না। তাই তাদের পান্ট দেয়া হয়েছে। সঙ্গে লম্বা বুস শার্টও দেয়া হয়েছে। উনি বললেন, আপনারা মহিলাদের গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে নিয়েছেন, আনসারে নিয়েছেন। রাস্তায় তাদের কেমন দেখা যায়।

আমি বললাম, আপনার ঘরে বোন-মেয়ে আছে না, তাদের যদি ঘরে কেমন কেমন না দেখায় তবে রাস্তায় অন্য মেয়েদের কেমন কেমন দেখাবে কেন? তারপর আমি তাকে বললাম, মহিলাও আল্লাহতায়ালা বানিয়েছে–

www.nagorikpathagar.org

আমরা কী করব? এটা সত্য যে মহিলা ছাড়া চলে না। বিয়ে-সাদী না করলে চলে না। আবার কোনো কোনো মুসলমানদেরও চারটি বিয়ে করতে হয়। এরপরও মহিলাদের প্রতি বিদ্বেষ কেন? তারপর আমি তাকে বললাম, আমাদের দেশে অর্ধেক জনসংখ্যা মহিলা। তাদের ক'দিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেন? আমরা পারব না–সরকার পারবে না। গণ্ডায় গণ্ডায় সন্তান উৎপাদন করবেন– আমরা খাওয়াতে পারব না। তারপর চুপ। পরে উনি বললেন– ভাই সাহেব আমাদের একটা মাদ্রাসা আছে তার জন্য কিছু টাকা-পয়সা দেন। আমি বললাম তাই বলুন না কেন? আমি উনাকে এ পর্যায়ে বললাম, এই যে মেয়েরা গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে, আনসার-এ আসছে। তারা তো আপনাদের ঘরের মেয়ে। তাদের আটকাতে পারেন না। পারেন না এজন্য যে এদেরকে খেতে দিতে পারেন না।

এটা তারা বুঝে গেছে। সেজন্য কাজ করতে হবে পুরুষ-মহিলা সকলকে। কেউ কাজ না করে খেতে পারবে না। এর মধ্যে বিরাট একটা সমাজতন্ত্র রয়েছে। যদি বাস্তবভাবে উন্নতি করতে চান তবে প্রত্যেকটি কর্মক্ষম হাতকে কাজে লাগাতে হবে। সেজন্য আমরা গ্রামে গেছি। সকলকে কাজে নামিয়েছি, কোদাল ধরেছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির দু'তিনশ ছেলেমেয়ে গেছে খাল কাটতে। মেয়েরা এখনও যায়নি। আমি ওদের বলেছি তোমরা যাও না–তোমরা কী শুরু করলে? এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হয়েছে। আমি দু'তিন দিনের মধ্যে দেখতে যাব ওরা কী করেছে। এই যে যুবসমাজ তাদের মধ্যে নতুনভাবে নতুন নতুন ধরনের চেতনা সৃষ্টি করার জন্য আমরা চিন্তা করছি। প্রতিবছর নিউ জেনারেশন ডে পালন করব। আমরা এক সময় বের হয়ে যাব। তখন নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসবে। তাদের আগে থেকেই তৈরি করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রাজনীতি হয় তা জনগণভিত্তিক নয়। গত বছর ডাকসু'র নির্বাচনে জেএসডি বলল–বিরাট সংখ্যক ছাত্র আমাদের দলে এসেছে। আমরা ছাত্রদের মধ্যে থেকে আন্দোলন করে সারাদেশে ছড়িয়ে দেব। কিন্তু আন্দোলন আর হলো না। আন্দোলন হয়নি। কারণ তাদের প্রেক্ষাপটই ভুল। পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটেই তাদের আন্দোলনের চিন্তা। তাদের এ প্রেক্ষাপট ঠিক না। তাদের রাজনীতি সময়োপযোগী নয়, ভুল। সেজন্য পুরনো মার্কসীজম, লেনিনীজম হেরে যাচ্ছে।

এখন তারা সবাই মিলে চিন্তা করছে কীভাবে এটাকে বৈজ্ঞানিক করা যায়। এখানে একটা কথা আছে বিজ্ঞান এত দ্রুত গতিতে চলছে যে, এত

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক থিওরি আছে তাতে সব উলট-পালট হয়ে গেছে। পোল্যান্ড-এ তাই ঘটেছে। পোল্যান্ডের মানুষ দেখছে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে তাড়াতাড়ি একই জিনিস করে ফেলতে পারি এবং সেটা সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট জগতকে একটা উচ্চ পর্যায়ে এনে ফেলেছে।

মানুষের চোখকে আর বন্ধ করে রাখা যাবে না। তাই আমরা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সকল দরজা খুলে দিয়েছি। খবরের কাগজে বিরোধী দলীয় বক্তব্যে যে যা করতে যাচ্ছে করছে। আমরা একটা জিনিস বুঝে ফেলেছি বাংলাদেশের মানুষ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সকলকে বলতে দিতে হবে এবং এর মাধ্যমেই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতি কত উদার। আমাদের যে একটি কর্মসূচি রয়েছে তা সবচেয়ে ভালো। এটাই বাংলাদেশের জন্য উত্তরণের একমাত্র পথ। ধর্মের কথা বলছেন–হিন্দু ভাইয়েরা একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগ ছিল, এর অবশ্য একটা ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। তবে এখন দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে কেমন একটা পরিবর্তন আসছে। তারা বুঝতে পারছে তাদের কোনো সুবিধা হচ্ছে না। কারণ মানুষ মাত্রই নিজের দিকটি দেখে।

কার কত লাভ হচ্ছে তা দেখছে। আমাদের মধ্যে সকলে তো ফেরেস্তা নই। যারা দিনরাত ধর্মকে বিক্রি করে, তারা পোলাও আর গোশ্‌ত ছাড়া খেতে চায় না। তাদের কাছে বসলে পোলাও-র গন্ধ বা বোতলের গন্ধ পাওয়া যায়। দেখবেন যে যত আল্লাহকে বিক্রি করবে, কথায় কথায় কোরআনের উদ্ধৃতি দেবে, পর্দার আড়ালে তাদের কী ঘটছে। মানুষ অনেক চালাক হয়ে গেছে। আজকালকার বাচ্চারাও অনেক এগিয়ে গেছে। যোগাযোগের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগামী বছর প্রতি গ্রামে টেলিভিশন থাকবে। জনসংযোগ আরো উন্নতি হবে। আমরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি। গত চার বছরে এত মিটিং করেছি। মানুষের চোখ খুলে দিতে হবে। আমি অনেক মিটিংয়ে বলেছি–চাবুক লাগাতে হবে, শক্ত চাবুক।

আমি বিভিন্ন পার্টি মিটিংয়ে এবং জনসভায় বলেছি, ভাইসব কতদিন ঘুমিয়ে থাকবেন। বিদ্রোহ করেন। আমার বিরুদ্ধে নয়। শোষণের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও আমরা এসব না করলে আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। আমি বললাম, বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। আমাদের বিরুদ্ধে নয়। কারণ আমরাই বিদ্রোহ করতে বলেছি। আমি জানি আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, তাদের ঔপনিবেশিক মনোভাব এখনও বিদ্যমান। এমনকি ব্রিটিশদের চেয়েও বেশি।

www.nagorikpathagar.org

তাদের এলাকায় তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। কিছুদিনের মধ্যে তাদের পিঠে এমন চাপ পড়বে যে, ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ কাজ করতে হবে জনগণকে দিয়ে।

আমাদের বিরুদ্ধে আমরা একটি বিরোধী শক্তি সৃষ্টি করতে চাই। দেখবেন এটা এক বছরের মধ্যে এসে যাবে, সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর একটা কথা, রাজনীতিকে ঠিক রাখতে হবে। রাজনীতি কোনো সময়েই দাঁড়িয়ে থাকে না। আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে এগুলোকে ঠিক রেখে রাজনীতিকে সময়োপযোগী করতে হবে।

নইলে রাজনীতিতে ফাটল ধরে যাবে। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন– জাতীয়তাবাদের রাজনীতি বহির্মুখী, অন্তর্মুখী নয়। ইংরেজিতে তাকে আউট ওয়ার্ড লুক বলে। আপনাকে ঝর্ণার মতো ছড়িয়ে যেতে হবে। রাশিয়ানরা যে রাজনীতি করছে তা ভিতরমুখী। ফলে তাদের রাজনীতি ভেঙে যাচ্ছে। সোশ্যালিস্ট দেশে একচেটিয়াভাবে তা রয়েছে। ওখানে গেলে দেখবেন তারা ভয় পাচ্ছে–যদি অসুবিধা হয়। একজন দু'জনের হয়তো অসুবিধা হবে, কিন্তু জাতি হিসেবে লাভবান হবে। আমি কিন্তু খুব সোশ্যালিস্ট, লেফট, প্রোগ্রেসিভ। কারণ আমি হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলাম আর্মিতে থাকাকালীন আমি তো চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আমার চেয়ে বামপন্থী কেউ না। যারা বামপন্থী রাজনীতি করেন তাদেরও চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। কী হলো? আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বহির্বিশ্বমুখী হতে হবে। ঝর্ণার পানির মতো ছড়িয়ে পড়তে হবে। আবার বাইরে থেকে আনতে হবে–আনতে হবে আবার ছড়িয়ে দিতে হবে। রাজনীতি হলো একটা ইন্টার অ্যাকশন। যেমনভাবে ইঞ্জিনের চাকা, স্টিম ইঞ্জিনের চাকা যেভাবে সামনে যাচ্ছে, পিছনে আসছে–তেমনি করতে হবে। রাজনীতির সবচেয়ে বড় বাহন হচ্ছে সংগঠন। সে কথা পরে, আর একটি কথা হলো জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যদি দুর্বল হয় তাহলে আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনারা দুর্বল থাকতে পারেন না। যে দেশেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি হয়েছে সেখানেই আক্রমণ হয়েছে। যেমন এখন আমাদের ওপর আঘাত খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আরো পিটানোর দরকার রয়েছে। আপনাদের শক্ত হতে হবে। বন্দুক, পিস্তল দিয়ে নয়। বন্দুক, পিস্তল দিয়ে রাজনীতি হয় না।

আমি একদিন বন্দুকধারী ছিলাম। পুরো যুদ্ধের সময়ও আমি কিন্তু বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াইনি। কারণ, বন্দুক যুদ্ধেও জিতায় না। রাজনীতিতেও জিতায় না। একথা বলার কারণ আছে। একটা কথা

www.nagorikpathagar.org

(পাওয়ার কামস্ ফ্রম দি ব্যারেল অব এ গান) বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। কিন্তু ব্যারেল আসে কোথা থেকে? অন্য কোনো জিনিস থেকে। আপনারা যদি বিশ্লেষণ করেন তবে বুঝবেন। আমি নিজেও সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি। কিন্তু আমি দেখলাম–এটা সত্য নয়। (পলিটিক্যাল পাওয়ার অব মিলিটারী পাওয়ার কামস্ ফ্রম দি পিপলস্) রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা উভয়ই আসে জনগণের কাছে থেকে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে কম সংখ্যক।

এর চারপাশে গড়ে তুলছি প্যারা মিলিটারী ফোর্স। আর জনগণের ফোর্স। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এক কোটি যার মোট সংখ্যা, এর মধ্যে মহিলা রয়েছে ৩৫ লাখ। এটাকে বাড়িয়ে আমরা আগামী বছর দু'কোটি করব। এরা সবাই জাতীয়তাবাদী। এরা অনেকে আমাকে বলেছে– 'স্যার আমাদের ইউনিফর্ম দেন, হাতিয়ার দেন আমরাই স্বাধীনতা রক্ষা করব'। স্কুল-কলেজের মেয়েরা, এমনকি গৃহবধূরাও একথা বলেছে। পুরো জাতিটাকে সংগঠন করতে হবে। এর ফল কিন্তু আপনারা পেতে শুরু করেছেন। বিভিন্নভাবে ফল পাচ্ছেন। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। আমরা অনেককেই ফল দিতে পেরেছি। যারা কোটিপতি হবে তারাও মনে রাখবেন যে, জাতীয়তাবাদী দলের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন। আমরা কখনই জাতীয়তাবাদী চোর অঙ্গদল, বাটপার অঙ্গদল করব না। জেএসডি যে সোস্যালিজমের কথা বলেছে কাজে তার উল্টো করেছে। তাদের এক নেতা ওয়েস্ট জার্মানিতে গিয়ে এত টাকা কামিয়েছে যে ওয়েস্ট জার্মান সরকার বিরক্ত হয়ে ভিসা সিস্টেম চালু করেছে। আগে ভিসা সিস্টেম ছিল না।

তাহলে ভাবেন এগুলো কি সমাজতান্ত্রিক নেতা? তাদের অনেক বড় বড় নেতা আমার কাছে এসেছে। আমি তাদের বলেছি, ভাই সোশ্যালিজমের ওপর ১০ মিনিট বলেন তো। তারা দু'মিনিটের বেশি কেউ বলতে পারেনি। তারা শুধু দু'চারটা ইন্টারন্যাশনাল নেতার নাম জানেন মার্কস, লেনিন, মাও ইত্যাদি। ট্রটস্কাইট কী? দেখেন উনাদের এ ট্রটস্কাইট রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই এসব কিছু মনে রেখে আমাদের পথ চলতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে।

সূত্র : ৭ নভেম্বর ২০০৭, দৈনিক দিনকাল

www.nagorikpathagar.org

জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা নিজ কানে শুনেছেন শেখ হাসিনা ড. ওয়াজেদ মিঞার একান্ত সাক্ষাৎকারে একাত্তরের জবানবন্দি

সৈয়দ আবদাল আহমদ

একাত্তরে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা ২৭ মার্চ '৭১ শেখ হাসিনা নিজ কানে শুনেছেন। আণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী ড. মোজাম্মেল হোসেনের মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঝিলপাড়ের বাড়িতে থেকে শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়া একসঙ্গে ওই ঘোষণা শুনেছিলেন। রেডিওতে প্রচারিত ঘোষণাটি শুনে সেদিন উজ্জীবিত হয়েছিলেন তারা।

১৯৯১ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা আণবিক শক্তি কমিশন অফিসে আমাকে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম. ওয়াজেদ মিয়া একথা জানিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা একাত্তরের বন্দিশিবিরে কীভাবে কাটিয়েছিলেন সে কাহিনি জানার জন্য ওই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ড. ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনার বন্দিশিবিরের জীবন ছাড়াও সেদিন তার লেখা 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু স্মৃতি কিছু কথা' শীর্ষক প্রকাশিতব্য বইয়ের পাণ্ডুলিপির গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায়েও আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। ফলে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করতে আমার বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এজন্য বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত আমাকে ড. ওয়াজেদ মিয়ার অফিসে কাটাতে হয়। অবশ্য মধ্যাহ্নের খাবার এবং কিছুক্ষণ পরপর চা-নাশতার আপ্যায়ন করতে ভোলেননি ড. ওয়াজেদ মিয়া। পরে ওই পাণ্ডুলিপিটিই বই আকারে বের হয়।

একাত্তরে শেখ হাসিনার বন্দিজীবন নিয়ে ড. ওয়াজেদ মিয়ার ওই সাক্ষাৎকারটি ১৯৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলার বিজয় দিবস সংখ্যায় 'যেন এক দুঃস্বপ্ন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ড. ওয়াজেদ মিয়ার

www.nagorikpathagar.org

এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার একটি নেপথ্য কাহিনি রয়েছে। দৈনিক বাংলার বিজয় দিবস সংখ্যার জন্য সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার একাত্তরের বন্দিজীবন নিয়ে দুটি নিবন্ধ লেখার সিদ্ধান্ত হয়। খালেদা জিয়ার বন্দিজীবন সম্পর্কে আমাকে এবং শেখ হাসিনার বন্দি জীবন সম্পর্কে লেখার দায়িত্ব দেয়া হয় দৈনিক বাংলার তৎকালীন সিনিয়র রিপোর্টার শওকত আনোয়ারকে। বার্তা সম্পাদক ফওজুল করিম (তারা ভাই আমাদের লেখার জন্য ৭ দিন সময় দিয়েছিলেন। আমি যথারীতি ৭ দিনের মধ্যেই বেগম খালেদা জিয়ার একাত্তরের বন্দিজীবন লেখাটি তৈরি করে জমা দেই। কিন্তু শওকত ভাই দশদিন পর অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে ওই দায়িত্বটিও আমার ওপর বর্তায়।

চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর তেজস্ক্রিয় গুঁড়ো দুধ নিয়ে বাংলাদেশে বেশ হইচই পড়েছিল। চট্টগ্রামে তেজস্ক্রিয় গুঁড়ো দুধ ধরা পড়েছিল। আণবিক শক্তি কমিশনে এই দুধ পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই দুধের ওপর রিপোর্ট করতে গিয়ে ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাই অফিস অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই ড. ওয়াজেদ মিয়ার চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তৎক্ষণাৎ তাকে ফোন করে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করি। তিনি বিষয়টি অবহিত হয়ে বললেন, 'ওইসব ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেই। আমিই আপনাকে সবকিছু জানাতে পারব'। ফলে পরদিনই তার কাছে ছুটে যাই এবং শেখ হাসিনার একাত্তরের বন্দিশিবিরের কাহিনি জেনে নিবন্ধ আকারে তা দৈনিক বাংলায় ছাপার জন্য জমা দেই। প্রকাশিত সেই নিবন্ধ এখানে তুলে ধরা হলো :

২৫ মার্চের বিভীষকাময় রাতে শেখ হাসিনা ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন সাত মসজিদ রোডের এক বাসায়। এই রাতেই পাক হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এ সময় তার মা বেগম মুজিব শেখ জামাল ও শেখ রাসেলকে নিয়ে দেওয়াল টপকে পাশের বাড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। শেখ কামাল আগেই ৩২ নম্বর থেকে অন্যত্র পালিয়ে যান।

৭ মার্চের পরই শেখ মুজিব বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। খাবার টেবিলে বসে একদিন তিনি বাড়ির সবাইকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে মানসিকভাবে তৈরি থাকতেও বলেছিলেন। তখন থেকেই তিনি নিয়ম করেছিলেন দুপুর ও রাতে দু'বেলা সবাই একসঙ্গে খাবেন।

www.nagorikpathagar.org

১৮ মার্চের পর পরিস্থিতি যখন আরও জটিল হয়ে ওঠে, তখন তিনি শেখ হাসিনা ও ডক্টর ওয়াজেদকে পৃথক বাসা ভাড়া নিয়ে ৩২ নম্বর থেকে সরে যেতে বলেন। শেখ হাসিনা তখন অন্তঃসত্ত্বা।

ডক্টর ওয়াজেদ এ সময় হাতিরপুলে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি বাড়ির নিচতলা ভাড়া নেন। ঠেলাগাড়ি দিয়ে ওই বাসায় মালামালও নিয়ে আসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই বাসায় ওঠেননি শেখ হাসিনা। তারা ৩২ নম্বরেই রয়ে গেলেন। ২১ মার্চের পর শেখ মুজিব ডক্টর ওয়াজেদকে আবারও বাসা ভাড়া নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, তোমরা ৩২ নম্বর থেকে সরে যাও। ডক্টর ওয়াজেদ এবার সাত মসজিদ রোডে একটি বাসা ভাড়া নেন।

২৫ মার্চ রাত ১২টায় পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার কিছুক্ষণ আগে শেখ হাসিনা চলে আসেন সাত মসজিদ রোডের ওই বাসায়। সঙ্গে নিয়ে আসেন ছোট বোন শেখ রেহানা এবং শেখ শহীদের ছোট বোন শেখ জেলীকে। ডক্টর ওয়াজেদ এর আধ ঘণ্টা আগে কাজের ছেলে পাগলাকে নিয়ে ওই বাসায় আসেন।

২৫ মার্চ সারাদিন জমজমাট থাকার পর সন্ধ্যা থেকেই ফাঁকা হতে শুরু করেছিল ৩২ নম্বরের বাড়ি। ততক্ষণে সবাই বুঝে গেছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কি হতে যাচ্ছে কারও কাছেই তা স্পষ্ট ছিল না। রাত সাড়ে দশটায় পরিচিত একজন জরুরি খবর নিয়ে ছুটে আসেন শেখ সাহেবের কাছে। কিন্তু ফটক ছিল তখন বন্ধ। খবর পেয়ে ডক্টর ওয়াজেদ বেরিয়ে আসেন ফটক পর্যন্ত। তারপর তাকে নিয়ে যান শেখ সাহেবের কাছে। ওই ব্যক্তিই জানান পাকিস্তানিদের সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনার কথা।

এ খবর পেয়েই শেখ সাহেব ডক্টর ওয়াজেদকে শেখ হাসিনাদের নিয়ে তখনি ভাড়া বাসায় চলে যেতে বললেন। ২৭ মার্চে কারফিউর বিরতি পর্যন্ত এ বাসাতেই থাকেন শেখ হাসিনা। কারফিউয়ের বিরতির সুযোগে ২৭ মার্চ সকালে ডক্টর ওয়াজেদ বেরিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ আগে দেওয়াল টপকিয়ে তার বাসায় এসে একটি ছেলে জানায়, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবুও অন্যদের কী অবস্থা তা জানতে ডক্টর ওয়াজেদ ৩২ নম্বরের কাছে যান। পথে এক বাসায় খবর পেলেন বেগম মুজিব তার সাত মসজিদের বাসার দিকে রওনা হয়েছেন। ডক্টর ওয়াজেদ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসেন সাত মসজিদের বাসায়।

এখানে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে তিনি যোগাযোগ করেন মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় তার বন্ধু ড. মোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে। আণবিক শক্তি

www.nagorikpathagar.org

কমিশনে তারা একসঙ্গে চাকরি করতেন। কিন্তু বন্ধুর বাসায় একটি মাত্র কক্ষ খালি ছিল। তাই তারা দুটি ভাগে ভাগ হলেন। শেখ মুজিবের ফুফাতো ভাই মোমিনুল হক খোকা বেগম মুজিব, শেখ রেহানা, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলকে নিয়ে চলে যান ওয়ারীতে তার শ্বশুর বাড়িতে। ডক্টর ওয়াজেদ শেখ হাসিনা ও জেলীকে নিয়ে যান মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঝিলের কাছে বন্ধুর বাসায়। সেদিন ছিল ২৭ মার্চ। বাসায় তারা অবস্থান করছেন। সন্ধ্যায় বন্ধু মোজাম্মেল হোসেন তাকে ডেকে বললেন, রেডিওতে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। ডক্টর ওয়াজেদ ও শেখ হাসিনা জিয়ার সেই ঘোষণা নিজ কানে শুনলেন এবং অভিভূত হলেন।

ওই বাসায় শেখ হাসিনা ও ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার পাঁচদিন কেটে যায়। ১ এপ্রিল মোমিনুল হক খোকা ওয়ারী থেকে এসে ডক্টর ওয়াজেদের নামে মালিবাগের একটি বাড়ির উপরতলা ভাড়া নেন। সেখানে বেগম মুজিব, শেখ রেহানা, শেখ জামাল, শেখ রাসেল ও খোকা এসে ওঠেন এবং ডক্টর ওয়াজেদকে খবর দেওয়া হয়। ডক্টর ওয়াজেদ শেখ হাসিনা ও জেলীকে নিয়ে ওই বাসায় গিয়ে ওঠেন। শেখ কামালও ওই বাসায় এসে বেগম মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে যান। এভাবে সপ্তাহখানেক থাকার পর বেগম মুজিব হঠাৎ জানতে পারেন যে, বাড়িওয়ালা তাদের পরিচয় জানতে পেরেছে এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছে। এ কথা জানার পর ডক্টর ওয়াজেদ মগবাজারে প্রধান সড়কের ওপর বেগম বদরুন্নেসার স্বামী আহমদ সাহেবের বাসা ভাড়া নেন। কিছুদিন সবাই ওই বাসায় থাকার পর দেখা গেল পাকবাহিনীর লোকজন সিভিল ড্রেসে সেখানে ঘোরাফেরা করছে। তাই নিরপদ নয় ভেবে ডক্টর ওয়াজেদ ও শেখ হাসিনা মগবাজারের ভেতরে একটি বাসা ভাড়া নেন।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে শেখ হাসিনার কথা হয়। তারা কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে শেখ হাসিনাদের ঢাকার বাইরে নিয়ে যওয়ার কথা জানান। একদিন সন্ধ্যায় শেখ হাসিনাসহ সবাই ঢাকার বাইরে পালিয়ে যাবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় ওইদিন সকালে দেখা গেল পাকবাহিনীর লোকজন বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। জনৈক মেজর হোসেন ও জালাল নামে দুজন অফিসার এসে বলল, শেখ মুজিবের পরিবারকে আমরা গ্রেফতার করতে এসেছি। ডক্টর ওয়াজেদ তাদের কাগজ দেখাতে বললে ওই অফিসার ধমক দিয়ে বলল, দেশে এখন সামরিক আইন। আমরা সেনাবাহিনীর লোক। আমাদের কাগজ লাগবে না। এখনি যেতে হবে বলে ওই অফিসার ফোন করে আরেকটি আর্মি ইউনিটকে

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে এলো। এরপর কর্ডন করে বেগম মুজিব, শেখ হাসিনাসহ সবাইকে নিয়ে গেল ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডের বাসায়।

বাড়িটি ছিল একতলা। ধানমন্ডি স্কুলের কাছাকাছি। বাড়িতে কোনো আসবাবপত্র ছিল না। পরিবেশ ছিল দমবন্ধ। জানালার কাচও ছিল ভাঙাচোরা। ডক্টর ওয়াজেদ ও শেখ হাসিনাসহ মুজিব পরিবারের সবাইকে ফ্লোরে চাদর বিছিয়ে থাকতে হলো। দু'দিন তেমন কিছুই খাওয়া হয়নি। ২ জন সৈন্য বাসাটি পাহারা দেয়। মেজর হোসেন বাসা থেকে যাওয়ার সময় বলে যায়, ঘরের ভেতর থেকে কেউ বের হতে পারবে না।

হানাদার বাহিনীর মেজর হোসেন একদিন ওই বাসায় এসে জানায়, মুজিব পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার জন্য সরকার টাকা দেবে। কিন্তু বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনা বললেন, সরকারের টাকা দরকার নেই। ড. ওয়াজেদকে বেতন দিলেই চলবে। পরে এ ব্যবস্থাই হলো। ডক্টর ওয়াজেদ অফিস করতেন। তার বেতন দিয়ে খরচ চলত। বাসায় একটি কাজের ছেলে ছিল। সে বাজার করত। এমনিভাবে মে-জুন কেটে যায়।

বাসায় ডিউটিরত পাক সেনারা রাতে জানালার পাশে বেয়নেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। গুলির আওয়াজ পেলেই দেখা যেত ডিউটিরত হাবিলদার স্টেনগান নিয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকত। ভয়ে কারও ঘুম আসত না। শেখ হাসিনা বেগম মুজিবের কাছে ঘুমাতেন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগছিলেন তিনি।

স্মৃতিচারণ করে ডক্টর ওয়াজেদ বলেন, এমনিভাবে জুলাই মাস এসে যায়। শেখ হাসিনার সন্তান জন্মের সময় ঘনিয়ে আসে। কিন্তু পাক সেনারা কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যেতে দেবে না। অনেক অনুরোধের পর শেষে ডাক্তার ওদুদকে দেখানোর অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু পাক আর্মি গার্ড দিয়ে ডাক্তার ওদুদের বাসায় যেতে হতো। ২ জুলাই শেখ হাসিনাকে ঢাকা মেডিকেলের একটি কেবিনে ভর্তি করা হলো। ২৭ জুলাই রাত ৮টায় তাকে লেবার ওয়ার্ডে নেওয়া হল। নির্ধারিত সময়ের এক মাস আগেই আমাদের সন্তান জন্ম নেয়। হাসপাতালে রাতে আমি থাকতাম। খবর পেয়ে অনেক আত্মীয়স্বজন দেখতে আসতেন। শেখ হাসিনাকে দেখাশোনার জন্য বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন লিলি ফুফু আম্মা হাসপাতালে থাকলেন। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন পাক সেনারা এসে সব আত্মীয়স্বজনকে ধমকিয়ে বের করে দেয়। তারা লিলি ফুফু আম্মাকেও বের করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা কেঁদে ফেলায় তাকে থাকার অনুমতি দেয়।

www.nagorikpathagar.org

হাসপাতাল থেকে শেখ হাসিনা ও ছেলেকে নিয়ে ডক্টর ওয়াজেদ ধানমন্ডির ১৮ নম্বর বাসায় গেলে ছেলে দেখে বেগম মুজিব খুশি হলেন। তিনি বললেন– 'আমার তো ভাই নেই, ওর নাম তাই রাখলাম 'সজিব'। আর মুক্তিযুদ্ধের সময় জন্মেছে, তাই ডাকনাম রাখলাম 'জয়'। মুজিবের সঙ্গে মানাবে ভালো।

শেখ হাসিনার সন্তানের নাম 'জয়' রাখা হলো কেন এ নিয়েও পাক সেনারা কটাক্ষ করেছে। নভেম্বরের দিকে ডক্টর ওয়াজেদ দেখেন ওরা বাংকার খুঁড়ছে। শেখ হাসিনা তাকে বললেন, সম্ভবত ওরা আমাদের মেরে ওখানে পুঁতে রেখে যেতে পারে। এ অবস্থায় কী করা যায়? ডক্টর ওয়াজেদ পিজি হাসপাতালে চলে গেলেন ডাক্তার নূরুল ইসলামের পরামর্শে অসুখের কথা বলে। কারণ ডক্টর ওয়াজেদ বাইরে থাকলে হয়তো খান সেনারা মুজিব পরিবারকে হত্যা করতে সাহস করবে না এই মনে করে।

৩ ডিসেম্বর থেকে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পিজি হাসপাতালকে মিলিটারি হাসপাতাল করা হয়। এ অবস্থায় ১৪ ডিসেম্বর ডক্টর ওয়াজেদ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের কাছে এক বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেন এবং ১৮ নম্বরের বাসা সম্পর্কে খেয়াল রাখেন। ওইদিনই পাকবাহিনীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের চরমপত্র দেওয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। ১৭ ডিসেম্বর সম্মিলিত বাহিনী এসে পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। মুক্তি পান বেগম মুজিব। মুক্তি পান শেখ হাসিনা ও পরিবারের অন্যরা।

সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২৬ মার্চ ২০১০

www.nagorikpathagar.org

একাত্তরের রণাঙ্গনে জিয়ার বীরত্বগাথা : শমসের মবিন চৌধুরীর স্মৃতিচারণ

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : বশীর আহমেদ

একাত্তরের রণাঙ্গনে জিয়াউর রহমানের বীরত্বগাথা লিখে শেষ করা যাবে না। তিনিই প্রথম ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। ২৭ মার্চ তিনিই চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং ৩০ মার্চ জাতির উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। রণাঙ্গনে তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সব সময় সামনে থাকতেন এবং কমান্ডারদের সৈনিকের সামনে থাকতে পরামর্শ দিতেন। চট্টগ্রামের একটি ভয়াবহ যুদ্ধে আমরা তাকে বাংকারে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সেখানে যাননি। বলেছেন, আমি বাংকারে গেলে আমার সৈনিকরা পালিয়ে যেতে পারে। বাংকারে গেলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়ের দু'দিন আগে সিলেটের এমসি কলেজের পাশ দিয়ে সিলেট শহরে ঢোকার আগে পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক গোলাবর্ষণের শিকার হয়েছিল জিয়ার বাহিনী। এ পরিস্থিতিতে সহকর্মীরা তাকে পিছিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেন, সবাই মরে গেলেও সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন।

একাত্তরের রণাঙ্গনে জিয়াউর রহমানের যুদ্ধ ও বীরত্ব সম্পর্কে এ তথ্য তুলে ধরেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী। রণাঙ্গনে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি। যুদ্ধ করতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তিনি গ্রেফতার হয়ে একাত্তরের বন্দি শিবিরে ছিলেন। একাত্তরে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাটি দেওয়ার পর সেটি কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে শমসের মবিন চৌধুরী নিউজ বুলেটিন আকারে কয়েকবার পাঠ করেন। রণাঙ্গনে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শমসের মবিন চৌধুরী জানান, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, বিশেষ করে রণক্ষেত্রে তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। রণক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের অভিজ্ঞতা অনেক আগের। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখিয়ে সবার দৃষ্টি কাড়েন তখন। তিনি প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন অফিসার হিসেবে ওই যুদ্ধে অংশ নেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নৈপুণ্য দেখিয়েছিল প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১৯৭১ সালের আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল একটি ভিন্ন ধরনের যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে তিনি অসীম সাহস এবং বীরত্ব দেখান। তিনিই প্রথম পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত করেন। জিয়াউর রহমানের সামরিক কৌশলের জ্ঞান ছিল অসীম এবং অতুল্য। শমসের মবিন চৌধুরী জানান, তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পাকিস্তানের সামরিক একাডেমিতে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি সেখানে সামরিক ইতিহাস পড়াতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধে সেখানকার সামরিক কমান্ডাররা যেসব রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোই মূলত জিয়াউর রহমান পড়াতেন। তাই কৌশলের ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল সীমাহীন। সেই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটান তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত একটি গেরিলা যুদ্ধ। আর এ গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ছিল জিয়াউর রহমানেরই। যুদ্ধকৌশল হিসেবে তিনি এই গেরিলা যুদ্ধকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে তিনি যখন বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করলেন, তখন তিনি দেখলেন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যসংখ্যা মাত্র ৩শ। তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক ছিলেন।

মাত্র সাতজন অফিসার এবং ৩শ সৈন্য নিয়ে ছিল অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য এবং অপ্রতুল অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি প্রথমে তার বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এই বিদ্রোহ ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ, যা জিয়াউর রহমানের মতো সমরনায়কের পক্ষেই সম্ভব ছিল। পাকবাহিনীর হাতে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। এমনকি চট্টগ্রামে একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টও ছিল। এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের ষোলশহরের কাছে। তিনি আমাদের চট্টগ্রাম শহর থেকে কালুরঘাট ব্রিজ হয়ে কর্ণফুলী নদীর ওপর নিয়ে গেলেন। তিনি যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে আমাদের তখন জানান,

www.nagorikpathagar.org

আমরা গেরিলা যুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধ করব। সুযোগ বুঝে আক্রমণ চালাব। আবার নিরাপদ স্থানে চলে যাব। এভাবে পাকবাহিনীকে আমরা হয়রানি করব। তাদের কোনোভাবেই আমরা স্থির থাকতে দেব না।

এরই মধ্যে মার্চের ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ অন্যান্য অঞ্চলেও বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে বাঙালি সিনিয়র সেনা অফিসারদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে মেজর জিয়াউর রহমান ছাড়াও মেজর শফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর (অব.) সি আর দত্ত, আবু ওসমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই মুক্তিযুদ্ধের একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়। ওইদিনই মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর করে দেয়া হয়। তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত ৩ ও ৪ এপ্রিলের বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয় বাঙালি সেনারা সশস্ত্র যুদ্ধ করবে, অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতাদের খুঁজে এনে একটি সরকার গঠন করা হবে। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় জেড ফোর্স। জেড ফোর্সের দায়িত্ব ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এছাড়া মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে এস ফোর্স এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে কে ফোর্স গঠন করা হয়।

জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্পর্কে শমসের মবিন চৌধুরী বলেন, আমি ছিলাম অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন লেফটেন্যান্ট। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে আমি যুদ্ধ করেছি। আমার নেতৃত্বে ছোট এক কোম্পানি সৈন্য ছিল। আমরা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান সৈন্যের বিরুদ্ধে কমবেশি গেরিলা টাইপ আক্রমণ করতে থাকি। মুখোমুখি যুদ্ধ করা আমাদের তেমনটি সম্ভব ছিল না। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও ছিল অত্যন্ত কম। পরে ভারত থেকে কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ আসতে থাকে, যেগুলো আমরা তখন ব্যবহার করেছি। এসময় জিয়াউর রহমানের নির্দেশে যুদ্ধের কৌশলের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। সে সময়ের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। জিয়াউর রহমান আমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, কালুরঘাট আসার পথে চকবাজারের মোড়ের রাস্তাটি যদি বন্ধ করে দিতে পার, তাহলে পাকিস্তান আর্মি শহর থেকে আর বাইরে আসতে পারবে না। তারা শহরের ভেতরেই আটকা পড়ে থাকবে। তিনি আমাদের শিখিয়ে দিতেন কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে, কোথায় মেশিনগান বসাতে হবে এবং কীভাবে পজিশন নিতে হবে। মাইক্রো লেভেলে যুদ্ধের এই কৌশলের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের পরিকল্পনা ছিল অসাধারণ। যুদ্ধক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সবসময়

www.nagorikpathagar.org

সামনে থাকতেন। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন, এটি একটি ভিন্ন ধরনের যুদ্ধ। You have to lead by an example, not by.

যেহেতু এটি একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ, তাই তোমাকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এজন্য তিনি সবসময় সামনে থাকতেন এবং আমাদের বলতেন, তোমাদের অবশ্যই কমান্ডার হিসেবে সামনেই থাকতে হবে, যাতে তোমার সৈনিকরা চোখ ফিরিয়ে দেখতে পারে তুমি তার পাশেই আছ। এটাই একজন কমান্ডারের মূল বৈশিষ্ট্য।

আরেকটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। ১১ এপ্রিল আমি আহত হয়ে পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরা পড়ার আগের ঘটনা এটি। দিনটি ছিল সম্ভবত ৭ এপ্রিল। কালুরঘাট ব্রিজের পাশে আমরা অবস্থান নিই। পাকিস্তান আর্মি খবর পেয়ে যায় মেজর জিয়াউর রহমান এখানে আছেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় টার্গেট। এরপর পাকিস্তান আর্মি আমাদের ওই স্থানে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ শুরু করে। আমাদের ডানে-বামে, সামনে-পেছনে অবিরাম গুলিবর্ষণ চলছে। একই সঙ্গে শেলিংও হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটি ভয়াবহ অবস্থা। আমি জিয়াউর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলাম– স্যার, আপনি কি কোনো বাংকারে যাবেন কিনা? তিনি তখন বললেন, My name written on it, it will find me whenever I go. I will not go inside any bunker. That will discourage my troops. We must lead by example, not just by command.

সুতরাং বাংকারে গেলে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এর কোনো নিশ্চিয়তা নেই। আর আমি যদি বাংকারে চলে যাই, তাহলে আমার সৈনিকেরা পালিয়ে যেতে পারে। কারণ পাকিস্তান বাহিনী যেভাবে গুলিবর্ষণ করছে, তাতে একজন সাধারণ সৈনিকের ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সবচেয়ে বড় কথা তোমার মৃত্যু থাকলে তা কেউ রোধ করতে পারবে না। এসবই ছিল রণক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের বীরত্বের দৃষ্টান্ত। সত্যি কথা বলতে কি, জিয়াউর রহমানের যে বীরত্ব ও সাহস ছিল তা অকল্পনীয়। খুব কম লোকের মাঝেই এমনটি খুঁজে পাওয়া যায়।

শমসের মবিন চৌধুরী বলেন, আর একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে গিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র পাকিস্তানিদের জন্য একটি সহজ টার্গেট ছিল। স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে জিয়াউর রহমানকে একাধিকবার কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে যেতে হয়েছিল। ২৭ মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং ৩০ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। তিনি নিজেকে

www.nagorikpathagar.org

ভারপ্রাপ্ত সরকার প্রধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেদিন। এটা ছিল তার রাজনৈতিক সাহসের একটি বড় পরিচয়।

মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি সামরিক যুদ্ধ ছিল না। এর সঙ্গে রাজনীতির একটি বিরাট সম্পৃক্ততা ছিল। তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আহ্বান জানালেন। বিশ্ববাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিলেন যে, বাংলাদেশের সব মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করছে। ১৯৬৫ সালে তিনি শুধু সামরিক দূরদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। আর '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। তাই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করতে হবে এই সার্বিকভাবে। অনেকেই চেষ্টা করেন জিয়াউর রহমানকে শুধু একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে মূল্যায়ন করতে। কিন্তু সেক্টর কমান্ডার তো অনেকেই ছিলেন। মোট ১৬ জন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। নেতা তো হয়েছেন মাত্র একজন। যে নেতার নামে আজ একটি আদর্শ তৈরি হয়ে গেছে বাংলাদেশে। হাতে বন্দুক ছিল বলেই এটা হয়নি। তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সাহস সর্বোপরি তার ব্যক্তিত্ব তাকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যায়।

১১ এপ্রিল আমি আহত হয়ে পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ার পরে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণের পর তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। তখন আমার সঙ্গে আবার দেখা হয়।

তবে আমি বন্দি থাকার সময় আমার পাশের রুমে পাকিস্তানি সেনা অফিসাররা প্রায়ই জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আলোচনা করত। তাদের ওই কথাবার্তা আমি শুনতে পেতাম। তাদের মূল টার্গেট ছিল জিয়াউর রহমান। তারা বলাবলি করত, রহমানকে যদি আটকানো যায় তাহলেই বাঙালিদের মনোবল ভেঙে যাবে অনেকটা। জিয়াউর মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান রণক্ষেত্রে যে বীরত্ব দেখান তা আমার চেয়ে আরও ভালো বলতে পারবেন মীর শওকতসহ অন্যরা।

পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে জিয়াউর রহমানের বীরত্বের অনেক কাহিনী আমি শুনেছি। কর্নেল জিয়াউদ্দিন আমাকে একটি ঘটনার কথা বলেছেন। স্বাধীনতা লাভ অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের মাত্র দু'তিনদিন আগে জিয়াউর রহমান সিলেটের এমসি কলেজের পাশ দিয়ে সিলেট শহরে ঢোকার জন্য রওনা হন। পাশেই পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান ছিল। জিয়াউর রহমান এবং তার সহযোগীদের গাড়ির ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ

www.nagorikpathagar.org

শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী। এ পরিস্থিতিতে অন্য অফিসাররা জিয়াউর রহমানকে পিছিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু জিয়াউর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন আমরা সবাই মরে গেলেও সামনের দিকে এগিয়ে যাব। জিয়াউর রহমানের এই বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণেই সেদিন সিলেট শহরের পতন ঘটে। জিয়াউর রহমান যে কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং আমাদের সবসময় বলতেন, আমার জীবন এবং একজন সাধারণ সৈনিকের জীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একজন সৈনিক যদি তার জীবন বিসর্জন দিতে পারে, তাহলে কমান্ডার হিসেবে আমি কেন পারব না?

জিয়াউর রহমানের ত্যাগের আর একটি উদাহরণ আমি দিতে পারি। ২৫ মার্চ রাতে তিনি বিদ্রোহ করার পর আমাদেরসহ ৩শ সৈনিক নিয়ে কালুরঘাটে যাওয়ার পথে নিজের বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাসায় তার স্ত্রী ও দু'ছেলে ছিলেন। আমি জিয়াউর রহমানকে বললাম, স্যার বাসায় তো ভাবী আছেন, এক মিনিটের জন্য হলেও তো তাকে দেখে যেতে পারেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিলেন, তাহলে বাকি এই ৩শ' পরিবারের কী হবে? সামনের দিকে এগিয়ে চলো। তাদের আল্লাহ দেখবেন।

এ সবকিছু মিলিয়ে রণক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের তুলনা তিনি নিজেই। তিনি বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পুরো দেশবাসীকে উজ্জীবিত করেন। অন্যদিকে দীর্ঘ নয় মাস রণাঙ্গনে থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। সব মিলিয়ে বিবেচনা করলে আমাদের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিশ্চিতভাবে সবার উপরে।

সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ৩০ মে ২০১০

www.nagorikpathagar.org

জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ও কালুরঘাট যুদ্ধ : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) খালেকুজ্জামানের বর্ণনা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) চৌধুরী খালেকুজ্জামান ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একাত্তরের ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন মেজর জিয়া। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের এই বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাক আর্মির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা, পাক সেনাদের গ্রেফতার করা, চট্টগ্রাম থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করা বিশেষ করে কালুরঘাট যুদ্ধে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিগ্রেডিয়ার জেনালের (অব.) খালেকুজ্জামান (তৎকালীন ক্যাপ্টেন)। মুক্তিযুদ্ধের সেই বীরত্বপূর্ণ স্মৃতি সাংবাদিক বশীর আহমেদের কাছে বর্ণনা করলেন তিনি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অস্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেই বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট বর্ণনার আগে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের বিষয়টি বলা দরকার। তৎকালীন পাকিস্তান আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের প্রক্রিয়টি একটু ভিন্ন ছিল। অন্যান্য রেজিমেন্ট যেমন–ফার্স্ট বেঙ্গল, সেকেন্ড বেঙ্গল, থার্ড বেঙ্গলসহ অন্যান্য ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে কিছু কিছু সৈন্য এবং আর্মি হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক কিছু প্রশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে গঠন করা হয় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। অফিসারদেরও আনা হয় বিভিন্ন ইউনিট থেকে।

মেজর জিয়াউর রহমান যথেষ্ট সিনিয়র অফিসার ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সিও হবেন, এটা চিন্তা করেই তাকে এখানে আনা হয়েছিল। সিও হিসেবে আনা হয় একজন অবাঙালি অফিসারকে। যিনি ফোর বেঙ্গলে ছিলেন। তার নাম মেজর আবদুর রশীদ জনজুয়া। পরবর্তী সময়ে তিনি লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি পান। এছাড়া মেজর কেলভি, লে. শমসের মবিন চৌধুরী লে. মাহফুজুর রহমানসহ আরো কিছু অফিসার এখানে আসেন। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আসলে পরিপূর্ণ কোনো ইউনিট ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

এখানে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩৫০ জনের মতো। তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। কোনো মেশিনগান ছিল না। এলএমজি ছিল দুটি, মর্টার ছিল একটি এবং কিছু রাইফেল ছিল। আসলে এই সামান্য অস্ত্রশস্ত্র এখানে দেওয়া হয়েছিল শুধু প্রশিক্ষণের জন্য। সিদ্ধান্ত ছিল আমরা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানের খায়রিয়ায় ফিরে যাব। শক্তির দিকে দিয়ে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল খুবই দুর্বল।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সাল ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বছর বন্যা হয়। অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। তবে সবকিছুর ওপরে অস্থিরতা সবসময় ছিল। বছর পার হয়ে নতুন বছর এলো ১৯৭১। ঘনিয়ে এলো মার্চ মাস। মার্চ মাসের প্রথম থেকেই আমরা দেখছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টসহ রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এসব আলোচনা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত হচ্ছিল না। আমরা বুঝতে পারছিলাম এ আলোচনা থেকে কোনো সুফল আসবে না।

সেনাবাহিনীর লোক হিসেবে আমরা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম না। কিন্তু খোঁজখবর রাখতাম কী হচ্ছে। নির্বাচনে যে দল জয়লাভ করল তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হচ্ছে না। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা; কিন্তু তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না–সব মিলিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম আমাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় না এবং নিজেদের হাতেই যে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়, এই বোধ বাঙালি অফিসার এবং সৈনিকদের মধ্যে ছিল।

আমি নিশ্চিত, আমাদের ধ্বংস করার জন্য অপারেশন সার্চ লাইট নামে যে পরিকল্পনা চলছিল তার সঙ্গে লে. কর্নেল জানজুয়া সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সবসময় আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখার কৌশল নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। এর মধ্যে একটি ছিল বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা। ২৫, ২৬ এবং ২৭ মার্চ এই প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত ছিল। ২৫ মার্চ সকালে দুটি দলের মধ্যে বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একটি দলে আমি খেলেছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন রেফারি। খেলা শেষে আমি অফিসার্স মেসে ফিরে গেলাম এবং সাড়ে ৯টার ভেতরে অফিসে চলে এলাম। মেজর জিয়াউর রহমানও অফিসে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

এটি ২৫ মার্চের সকালের ঘটনার কথা বলছি। আমাদের অন্য একজন অফিসার মেজর মীর শওকত আলীকে ওইদিন চট্টগ্রাম বন্দরে একটি বিশেষ কাজ দেওয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সোয়াত নামে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভেড়ে। ওই জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আনা হচ্ছিল। মেজর শওকতকে অস্ত্র খালাসের কাজ যেন ঠিকমতো হয় তা তদারকি করতে বলা হয়। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা কিন্তু স্বাভাবিক ছিল না। ১ মার্চ থেকে সেখানে অবরোধ চলছিল। রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল। ২৩ মার্চ চট্টগ্রাম এলাকার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারকে কমান্ড থেকে সরিয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এম আর মজুমদার ছিলেন বাঙালি অফিসার। তার স্থলে পাঠানো হয় ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে। ব্রিগেডিয়ার আনসারী তখন পোর্টে ছিলেন। পোর্ট থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র খালাস করে সেনানিবাসে নেওয়া হচ্ছিল। আমি এবং মেজর জিয়া ২৫ মার্চ বিকালে পুরা চট্টগ্রাম শহর ঘুরে দেখে এলাম সার্বিক পরিস্থিতি কী। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখলাম, তাতে মনে হলো আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। মেজর জিয়া অফিসে গেলেন এবং আমি মেসে গেলাম। আমরা দুজনে আবার মাগরিবের পর ফিরে এলাম। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সামনে একটি ফাঁকা জায়গা ছিল। আমি এবং মেজর জিয়াউর রহমান কথা বলছিলাম। হঠাৎ দেখলাম বেলুচের একটি ট্রাক আসছে। তখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ইলেভেন পাঞ্জাবে কিছু সৈন্য এবং লে. কেয়ানি নামে একজন অফিসার ছিলেন।

আর টুয়েন্টি বেলুচের সিও ছিলেন লে. ফাতমি। এ ব্যাটালিয়ানটি ছিল খুবই দুর্ধর্ষ। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তারা অংশ নেয়। আমি এবং মেজর জিয়াউর রহমান কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, কী হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ সেখানে লে. কর্নেল হামিদ এলেন। তিনি এক সময় আমার সিও ছিলেন। মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তার খুব ভালো পরিচয় ছিল। কিন্তু লে. কর্নেল হামিদ আমার সঙ্গে কিছু কথা বলে চলে গেলেন। মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। এটি আমাকে খুবই অবাক করল। একটু পরই টুয়েন্টি বেলুচের একটি ট্রাক এলো। ট্রাকটিতে মেশিনগান ফিট করা ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম সেখানে চারজন সৈনিক। তারা আমাকে জানাল তাদের এখানে থাকতে বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়।

www.nagorikpathagar.org

আমি সঙ্গে সঙ্গে মেজর জিয়াকে বললাম, একটি কথা এখানে বলা দরকার, আমরা বিদ্রোহ করার পর মেজর জিয়াউর রহমান এ ঘটনাটি আওয়ামী লীগ নেতাদের জানানোর জন্য মেজর শওকতকে চট্টগ্রাম শহরে পাঠান। চট্টগ্রাম শহর মেজর শওকতের খুব পরিচিত ছিল। মেজর জিয়া মেজর শওকতকে বলেন, তুমি যাও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান, এম আর সিদ্দিকী, জহুর আহমেদ চৌধুরী তাদের বলো আমরা বিদ্রোহ করেছি স্বাধীনতার পক্ষে। পরে শহরে একটি মাইকিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২৬ মার্চ ৯টা কি ১০টার দিকে কালুরঘাট এবং কাপ্তাই এলাকায় বেশকিছু আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল।

তাদের মধ্যে ছিলেন মরহুম আবদুল হান্নান, আতাউর রহমান কায়সারসহ অনেকে। তারা আমাদের খুবই উৎসাহ দেন। সেদিন আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থাই সাধারণ মানুষ করেছে। এ সময় জিয়াউর রহমান কক্সবাজার যাওয়ার চিন্তা করলেন। সেখানে গিয়ে কোনোভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগযোগ করা যায় কিনা। কারণ কক্সবাজারে শক্তিশালী রাডার ব্যবস্থা ছিল।

এছাড়া বিদেশি কোনো জাহাজের কোনো আনাগোনা ছিল কি না, সেটাও দেখতে হবে। আমরা ওইদিন কক্সবাজারে গিয়েছিলাম চারজন। মেজর জিয়া, আমি, মেজর শওকত এবং ক্যাপ্টেন অলি। মেজর জিয়া কক্সবাজারের এসডিও, এসডিপওসহ অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের ব্রিফ করেন। ২৭ মার্চ দুপুরবেলা আমরা কালুরঘাট ফিরে আসি মেজর জিয়া ছিলেন প্রচণ্ড মুভমেন্টের মধ্যে। তখন তিনিই আমাদের নেতা। তিনি নির্দেশ দিচ্ছিলেন আর ছুটে যাচ্ছিলেন একস্থান থেকে অন্যস্থানে।

এতবড় ঘটনা ঘটানোর পর আমরা আসলে বুঝতে পারছিলাম না বাইরে কী হচ্ছে। ইস্ট বেঙ্গলে অন্য কোথাও বিদ্রোহ হয়েছে কি না, তাও আমরা জানি না। আমরা সারাদেশে কতটুকু সমর্থন পাচ্ছি তাও আমাদের জানা ছিল না। এজন্য মেজর জিয়া তখন সিদ্ধান্ত নিলেন এ ঘটনা দেশবাসী এবং বহির্বিশ্বকে জানাতে হবে। তিনি কালুরঘাট রেডিও স্টেশনে চলে গেলেন। তিনি নিজেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। নিজের নামেই ঘোষণা দিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার। প্রথমবার তিনি ইংরেজিতে নিজের তরফে বলেছেন, 'আই মেজর জিয়াউর রহমান হিয়ার বাই প্রক্লেইম দ্য ইনডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ'। তার এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের পক্ষে আন্তর্জাতিক সহায়তা চান। পরে তিনি এ ঘোষণা কিছুটা সংশোধন করে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার

www.nagorikpathagar.org

ঘোষণা দেন। তিনি এখানে উল্লেখ করেন, 'আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবুর রহমান ইজ উইথ আস'।

এটি আলোচনা করেই করা হয়েছিল এবং এটিই যৌক্তিক হয়েছিল। কারণ স্বাধীনতার এ ঘোষণা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারত। এভাবেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হলো। মেজর জিয়া এ ঘোষণা বাংলায়ও দিয়েছিলেন। বাংলায় ছিল, 'আমি মেজর জিয়া বলছি...।' পরবর্তী সময়ে লে. শমসের মবিন চৌধুরী মেজর জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণা বেতার কেন্দ্র থেকে বারবার রিপিট করেন।

মেজর জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণার ফলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি ঘুমন্ত মানুষ যেন হঠাৎ জেগে উঠল। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সর্বত্র তখন মানুষ জানতে পারল আমরা কোথায় আছি। বহির্বিশ্ব জানতে পারল বাংলাদেশ নামে এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। সে দেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান নামে এক অফিসার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। মেজর জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণা ছিল বিরাট বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

স্বাধীনতা ঘোষণার তিনদিন পর ৩০ মার্চ পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দুটি বিমান হামলা চালিয়ে বেতারকেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়। এ হামলার সময় আমি সেখানেই ছিলাম। আমি সামান্য আহত হলেও বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। তখন কাপ্তাই প্রকল্পের ম্যানেজার ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সামছুদ্দিন। তিনি খুব সার্ভিস দেন। তিনি এবং তার লোক বারবার এসে কালুরঘাট রেডিও স্টেশনের ট্রান্সমিটারটি মেরামত করেন।

পরে ইঞ্জিনিয়ার সামছুদ্দিনকে পাকিস্তানি সৈন্যরা মেরে ফেলে। কালুরঘাট রেডিও স্টেশনের ট্রান্সমিটারটি খুব ছোট ছিল। পরবর্তী সময়ে এই ট্রান্সমিটারটি আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। এটিই হয় প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতারের ট্রান্সমিটার। ৩০ মার্চের পর রেডিও স্টেশনটি আর চালু করা সম্ভব হয়নি।

২৯ মার্চ সন্ধ্যা থেকেই কালুরঘাটে পাকিস্তান আর্মির ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সঙ্গে আমাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। ৩০ মার্চ সারাদিন যুদ্ধ চলে। ৩১ মার্চ প্রায় দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। এরপর এখানে আমাদের অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। এছাড়া আমাদের একটি বিষয় বুঝতেও সমস্যা হয়েছিল। পাকিস্তান আর্মির ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সদস্যরা ইপিআরের পোশাক পরা ছিল। আমরা ধারণা করেছিলাম, তারা আমাদের ইপিআরের সদস্য।

www.nagorikpathagar.org

ওই যুদ্ধে লে. শমসের আহত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে। এ সময় আরো অনেকে আহত হয়। ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়ার নির্দেশে আমরা কালুরঘাট ছেড়ে বান্দরবান-রাঙামাটি হয়ে মহালছড়িতে যাই। আমি সৈন্য নিয়ে মহালছড়িতে অবস্থান নেই। ক্যাপ্টেন অলি অবস্থান নেন রামগড়ে। ইতোমধ্যে জিয়াউর রহমান সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আগরতলায় যান। এ সময় জেনারেল ওসমানী দৃশ্যপটে চলে এসেছেন। মেজর জিয়া আগরতলায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে আসেন। তিনি মূলত আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধটি হয়েছিল বুড়ির ঘাটে। ওই যুদ্ধে আমি ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন মুন্সী আবদুর রউফ। সে ছিল মেশিনগান ম্যান।

সেদিনের দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও ভাসে। মুন্সী আবদুর রউফ আমার সামনেই শহিদ হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি পেয়েছেন। ওই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমরা আগে থেকেই সেখানে পজিশন নিয়েছিলাম। পাকিস্তানি সৈন্যরা রাঙামাটি হয়ে ৭টি স্পিডবোট ও একটি জাহাজ নিয়ে আসছিল। স্পিডবোটগুলো কাছাকছি এলেই আমরা ফায়ারিং শুরু করি। পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি খেয়ে পড়ছিল আর মরছিল। তাদের মধ্যে অনেক সাধারণ নাগরিকও ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা এসব সাধারণ মানুষকে শিল্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিল। বড় জাহাজটির মধ্যে ছিল সব পাকিস্তানি সৈন্য।

ওটিকেও আমরা ছাড়িনি। ব্যাপক হতাহত হয় সেখানে। পরবর্তী সময়ে জানতে পেরেছিলাম আমাদের হামলায় নিহত পাকিস্তানিদের লাশ ট্রাকে ভরে ভরে ক্যান্টনমেন্টে নিতে হয়েছিল। আমাদের অবস্থানটা ছিল ছোট্ট একটি টিলার ওপর, যার চারদিকে ছিল পানি। আমাদের পেছনে ফেরার কোনো উপায় ছিল না। তারুণ্যের বলেই সেদিন আমরা সেই অসাধ্যকে সাধন করেছিলাম। ওই যুদ্ধে আমাদেরও বেশ কয়েকজন মারা যায়। পরে আমরা সাঁতরে চলে আসি।

আমরা এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওই এলাকায় ছিলাম। একটি কথা গর্বের সঙ্গে বলতে চাই, আমরা যুদ্ধে অংশ নেইনি, যুদ্ধ শুরু করেছিলাম। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই ইতিহাস সত্যিকার অর্থেই বীরত্বগাথা। পরবর্তী সময়ে এক পাকিস্তানি জেনারেল মন্তব্য করেছিলেন, পাকিস্তান আর্মির যদি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মতো একটি ব্যাটালিয়ন থাকত, তাহলে আমাদের আর কিছুই করতে হতো না। শত্রুর মুখ থেকে আসা এ মন্তব্য আমাদের বড় পাওয়া।

www.nagorikpathagar.org

একটি কথা আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, মেজর জিয়া ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এর আগে ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ৩টায় তিনি অষ্টম বেঙ্গল ইউনিট লাইনে আমাদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তারও আগে ২৫ মার্চ রাত ১১টায় তিনি দেওয়ানহাট রেলওয়ে ওভারব্রিজের সামনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। এসবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি। আমি মনে করি, বিভিন্ন সময়ে মেজর জিয়া যে বিদ্রোহ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, তা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

সূত্র : ২৬ মার্চ ২০০৯, দৈনিক আমার দেশ

www.nagorikpathagar.org

ISBN: 978-984-94766-8-9